- - - শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্টের - -

কংগ্রেস-অভিভাষণ

(দ্বিতীয় সংস্করণ)



২৬শে ডিসেম্বর, ১৯১৭

মূল্য ছয় আনা।

ভূমিকা

বিগত কংগ্রেসের সভানেত্রীরূপে শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা ভারতবর্ষের রাজনীতিক সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। বাঙ্গালার রাজনীতিক সাহিত্য এখনও সমৃদ্ধ হয় নাই। ঐ সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন জন্য এবং বাঙ্গালা ভাষাভাষী ভ্রাতৃগণ যাহাতে মিসেস্ বেসাণ্টের অভিভাষণের সহিত পরিচিত হইতে পারেন এই উদ্দেশ্যে আমি শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয়ের সহকারিতায় ঐ অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ করিয়া কংগ্রেসের সময় দুই সহস্র মুদ্রিত করি। ঐ অনুবাদ সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সযত্নে দেখিয়া দিয়াছিলেন। অল্প দিনে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার পাঁচ হাজার ছাপা হইল; এই সংস্করণের মুদ্রণ কালে নায়ক সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় আদ্যোপান্ত যত্ন করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার, শ্রীযুক্ত কুলদা বাবুর এবং শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবুর কৃত সাহায্যের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি।

৮ই মাঘ,
১৩২৪ সাল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল,

বিরচিত

অন্যান্য পুস্তকাবলী।

১। শিক্ষা না সেবা ।৵০

২। জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব ॥০

৩। Philosophy of the gods ৸০

৪। গীতায় ঈশ্বরবাদ (পঞ্চম সংস্করণ) ১।০

৫। উপনিষদ্‌ ব্রহ্মতত্ত্ব ১।০

Two wonderful Books

By

Mrs. ANNIE BESANT

(No lover of India can be without them)

1. Birth of New India Re. 1-8
2. Congress Speeches As. 12

(Containing the full text of her Presidential Speech for 1917.)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী

১৩৯ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩২তম জাতীয় মহাসমিতির সভানেত্রী
শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্টের
অভিভাষণ।

(কলিকাতা, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ)

প্রতিনিধি ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ!

জননী ভারতভূমির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, সত্য সত্যই, এই জাতীয় মহাসমিতির সভানেতৃত্ব। আমার পূর্ব্বে যখন যিনি এই সম্মানের আসনে বিরাজ করিয়াছেন, তিনিই শোভন ভাষায় স্বীয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই আসন জননীর পূর্ণ স্নেহ, নির্ভর ও অনুমোদনের জাজ্বল্যমান নিদর্শন—কারণ, যিনি যে বৎসর এই আসন অধিকার করেন, তিনি সেই বর্ষের জন্য ভারতমাতার চিহ্নিত সেবকাগ্রণী। পরন্তু আমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যদি বা পর্য্যাপ্তভাবে নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, আমি কেমন ভাষায় আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব—আমার ঋণ যে তাঁহাদের অপেক্ষা শতগুণে অধিক! কন্‌গ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথমবার আপনারা এমন ব্যক্তিকে সভানেত্রী নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, যে নির্ব্বাচনের সময় রাজপুরুষদিগের বিরাগভাজন ছিল, এবং দেশের শান্তির পরিপন্থী বলিয়া

অন্তরাগে আবদ্ধ ছিল। যখন আমি হতমান ছিলাম, তখন আপনারা আমাকে সম্মানের কিরীটে ভূষিত করিয়াছিলেন; যখন আমি ধিক্কৃত ছিলাম, তখন আপনারা আমার সততা ও সদুদ্দেশ্যে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন; যখন আমি আমলা-শক্তির প্রতাপে পরাভূত ছিলাম, তখন আপনারা আমাকে নেত্রী বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন; যখন আমি বাধ্য হইয়া মৌনী ছিলাম এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ ছিলাম, তখন আপনারাই আমার পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন, এবং আমার জন্য নিষ্কৃতি-লাভ করিয়াছিলেন। আমি অকিঞ্চিৎ সেবিকারূপে জননীর সেবা করিয়া ধন্য হইতেছিলাম—আপনারা জগতের সমক্ষে আমাকে নেত্রীরূপে বরণ করিয়া এই উচ্চাসন দান করিলেন। আমার এমন কি বাগ্মিতা আছে, যাহার সাহায্যে আপনাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব? কি ভাষায় আপনাদের ধন্যবাদ দিব! ভাষা যখন এত দীন, তখন কর্ম্মের দ্বারা আমার মনোভাব ব্যক্ত হউক। আপনাদের এই অভিনন্দন আমি জননীর সেবায় নিয়োজিত করিব—আমার জীবন তাঁহার কার্য্যে উৎসর্গ করিব। আমার সর্ব্বস্ব মাতৃভূমির যজ্ঞ-বেদীতে নিবেদন করিলাম—আসুন, কেবল বাক্যে নয়, কর্ম্মের দ্বারা ঘোষণা করি—**"বন্দে মাতরম্"**।

ভারতের ভাগ্যচক্রের এই সন্ধিক্ষণে আমার নির্ব্বাচনে হয় ত একটা সার্থকতা আছে। সত্য বটে, জন্মতঃ ভারতসন্তান হইবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই—কিন্তু উত্তরসমুদ্রবর্ত্তী সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ আমার জন্মস্থান, পাশ্চাত্য দেশসকলের মধ্যে যে দেশ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান-সমূহের নির্ম্মাতা। অনেকেই জানেন যে, প্রাচীন যুগে আর্য্যজাতির যে সকল শাখা য়ুরোপভূখণ্ডে উপনিবেশ রচনা করে, তাহারা আপনাদের আসিয়াস্থ ধাত্রীভূমি হইতে স্বভাবসিদ্ধ আত্মবশ্যতার বীজ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে স্যাক্সন গ্রামসমূহে আমরা যে স্বায়ত্তশাসন দেখিতে পাই—পাশ্চাত্য ঐতি-

হাসিকদিগের মতে, তাহার পূর্ব্বরূপ এই ভূখণ্ডে প্রকট হইয়াছিল। তাঁহারা আরও বলেন যে, আধুনিক ইংরেজ জাতির যে বরণীয় স্বাধীনতা, তাহা স্বায়ত্ত ও স্বতন্ত্র প্রাচীন আর্য্য 'পল্লীসমাজ'-রূপ বীজের ফলবান্ বৃক্ষ মাত্র।

ইংলণ্ডের পল্লীসমাজে ঐ স্বাধীনতার বিকাশ নরম্যান অভিজাত-তন্ত্র (feudalism) দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল—যেমন এখানকার পল্লীসমাজের যুগসংরক্ষিত স্বাতন্ত্র্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ড ঐ নরম্যান-নিগড় ভগ্ন করিয়া এক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় জাতির ধাত্রী হইলেন, এবং স্ব-বশ পার্‌লামেণ্ট গড়িয়া তুলিলেন। এখানেও স্বায়ত্তশাসনের সেই সনাতন বীজ কনগ্রেস-রূপে এবং পরে মোস্‌লেম-লীগ-রূপে অঙ্কুরিত হইয়া এখন উভয়ের সমবায়ে হোমরুল বা স্বরাজরূপে পুষ্পিত হইতেছে। যে ইংলণ্ড মিলটন্, ক্রমওয়েল, সিডনী, বার্ক, পেইন, শেলী, উইলবারফোর্স ও গ্লাডষ্টোনের জননী, যে ইংলণ্ড ম্যাট্‌সিনী, কসথ্, ক্রোপট্‌কিন, ষ্টেপনেকের প্রভৃতির আশ্রয়দাত্রী, যে ইংলণ্ড গারিবলডীর আবাহনকর্ত্রী, যে ইংলণ্ড অত্যাচারের ও স্বেচ্ছাচারের শত্রু, যে ইংলণ্ড স্বাধীনতার উপাসিকা—আজ আমি বড় সাধে সেই ইংলণ্ডের প্রতিভূ রূপে আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান। আজ যখন ভারতবর্ষ নিজের পায়ে ভর করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—প্রসাদভিখারী জনসঙ্ঘ-রূপে নয়, পরন্তু স্বতন্ত্র, স্বালম্ব, স্বাধীনতাকামী জাগ্রত মহাজাতি-রূপে—আজ যখন ভারত-জননী আজ্ঞাধীন সেবিকা-রূপে নয়, কিন্তু সহচরী সখী-রূপে বৃটানিয়ার সহিত মিলিতে প্রস্তুত—তখন এখন এই মহামুহূর্ত্তে আমি দেহে প্রতীচ্যা হইলেও প্রাণে প্রাচ্যা, ইংলণ্ডের দুহিতা হইলেও ভারতের পুত্রিকা—আমি বৃটনের ও ভারতের মহামিলনের সূচী-রূপে আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি। এ মিলন হৃদয়ের মিলন, স্বেচ্ছাকৃত মিলন—হুকুমের মিলন নহে। সেই জন্য এ মিলন স্থায়ী মিলন, এ মিলন—বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। ইহা প্রেমের

তন্ত্র—সহযোগিতার 'রাখি'—ইহাতে উভয় জাতিরই কল্যাণ—ইহার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

শান্তিধামে

ভারতের প্রধান জননায়ক দাদাভাই নাওরোজী ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছেন। আজ যাঁহারা দিব্যধামে থাকিয়া ভারতের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন, অভ্যুদয়ের সহায়তা করিতেছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণাড়ে, এ, ও, হিউম, হেনরী কটন, ফিরোজ শা মেহেতা এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে—যাঁহারা কবি সিউনবারণের ভাষায় স্বাধীনতা-লোকের ধ্রুবতারা, যাঁহাদের—

"হে মানব! পূজ চিরদিন
স্বাধীনতা আর ইঁহাদেরে।
তোমার, আমার, মানবের তরে
দীপ্ত শিখামণি সদা শিরে ধরে'
(যাঁরা) আলোকিয়া পথ দেখাইলা নরে
স্বাধীনতা-দেবী অমলিন!
পারে যেন লভিতে তাঁহারে।"

—দাদাভাই সেই সকল অমৃতযাত্রীদিগের অন্যতম। ব্যর্থ স্তুতি-বচনে আমি তাঁহার স্মৃতির কি সম্মান করিতে পারিব? তাঁহার কীর্ত্তিই তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছে—তাঁহার প্রখ্যাত-মাতৃসেবাই তাঁহার অনশ্বর মহিমা। তাঁহার অদম্য সাহস ও অক্ষুণ্ণ দেশপ্রীতির অনুকরণ করিয়া যদি আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধিত হইতে পারিবে—তবেই সেই স্বরাজ আমরা অচিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব—যে স্বরাজ দেখিবার জন্য সেই মহাপুরুষ

উৎসুক ছিলেন, কিন্তু জড় নেত্রে দেখিতে পান নাই—যাহা দিব্যধাম হইতে দিব্যনেত্রে তিনি অচিরে দেখিতে পাইবেন।

যুদ্ধের পরিণাম।

যে মাহাযুদ্ধের আবর্ত্তে জাতির পর জাতি আকৃষ্ট হইয়া নিপতিত হইতেছে, সেই যুদ্ধ এখন চতুর্থ বর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। যেরূপ সতর্কভাবে সংবাদ-প্রকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে কতকালে এই মহাহবের বিরাম ঘটিবে, কর্ত্তৃপক্ষ ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহার পূর্ব্বনির্দ্দেশ অসম্ভব। তবে রাজনীতিকের চক্ষে নয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিলে আমার মনে হয়, এ যুদ্ধের পরিণাম নিশ্চিত। কারণ, এ যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য,—স্বেচ্ছা-তন্ত্রের এবং এক জাতি কর্ত্তৃক অপর জাতির উপর প্রভুত্ব-স্থাপনের অপকারিতা-প্রদর্শন ও বিলোপ-সাধন; আর প্রত্যেক জাতির ও (জাতীয় কল্যাণের অবিরোধে) প্রত্যেক ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসনে ও আত্মবিকাশে যে বিধিদত্ত অধিকার আছে, সুদৃঢ় ভিত্তিতে সেই অধিকারের ব্যবস্থাপন। সেই জন্য যে শক্তিনিচয় স্বেচ্ছা-তন্ত্রের দীর্ঘজীবনের অনুকূল (যে তন্ত্রে একের খামখেয়াল সকলের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা), এবং তদপেক্ষা অধিকতর সাংঘাতিক আমলা-তন্ত্রের দীর্ঘজীবনের পরিপোষক (যে তন্ত্রে এক ক্ষুদ্র অভিজাত-সর্ব্বস্ব সমগ্র জাতিকে নিগড়বদ্ধ রাখে), সেই সমস্ত শক্তিকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে যেন তাহাদিগকে মধ্য-য়ুরোপের জাতি-পুঞ্জে (জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়ায়) কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে—যেমন পুরাকালে রাবণ এই সকল শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া, নিজের ধ্বংস দ্বারা উহাদের উচ্ছেদের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। কারণ, প্রাচীনের চিতাভূমিতেই নবীনের প্রতিষ্ঠা হয়।

যে সকল দুর্নিমিত্ত বর্ত্তমান সভ্যতার উচ্চসৌধকে ধূলিশায়ী করিয়াছে,

তাহাদের উচ্ছেদ ভিন্ন নবযুগের নবাগত সভ্যতা—যাহার ভিত্তি হইবে ধর্ম্ম ও ন্যায়, সৌভ্রাত্র্য ও স্বাধীনতা, শক্তি ও সুখ—সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। অতএব ইহাই হওয়া চাই যেন অকাল-সন্ধি দ্বারা যুদ্ধের বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট পরিণাম ব্যাহত না হয়। কি পূর্ব্বে, কি পশ্চিমে, স্বেচ্ছাতন্ত্র ও আমলা-তন্ত্র সমূলে বিনষ্ট হইবে, এবং পাছে তাহার দগ্ধ বীজ হইতে ভবিষ্যতে অঙ্কুর উদ্‌গত হয়, সেই সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য ঐ দুই তন্ত্রকে মানুষের দৃষ্টিতে হেয় করিতেই হইবে; সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহাদের এমন প্রিয়তম ব্যসন যে যুদ্ধ—সে ক্ষেত্রেও স্বাধীন জাতির রাজ্যতন্ত্র অধিকতর কার্য্যক্ষম;—আর যদি বা তাহাদের কঠোর শাসনযন্ত্র আপাততঃ সম্পদ্‌ ও সফলতার ভাণ করে, তথাপি পরিণামে সে প্রণালী গণতন্ত্রের কমনীয় বিধিব্যবস্থার নিকট পরাভূত হয়ই। জগতের সমক্ষে তাহাদের অসারতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিতে হইবে —যেন আর কেহ তাহাদের বাহ্য চাকচিক্যে ও আপাতরম্য সফলতায় প্রতারিত না হয়। তাহাদের উপযোগিতার দিন চলিয়া গিয়াছে—এখন তাহারা কালের অনুপযোগী, স্থিতির অযোগ্য—তাহাদের বিনাশ সুনিশ্চিত।

ভারতবাসীর সাহায্য দান।

বৃটন যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, সে কিসের জন্য? এক ক্ষুদ্র জাতির সন্ধি-দ্বারা সুরক্ষিত স্বাধীনতার রক্ষার জন্য। সে সময় বৃটনের অধিকারিগণ যে সকল মহাসত্যের ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে ভারতবর্ষে এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য মহাদেশে একটা সজীবতার তাড়িত প্রবাহিত হইয়াছিল। তখন সাম্রাজ্যের সকল অংশের প্রজাবর্গ দ্বিধা না করিয়া, অবিলম্বে বৃটনের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিল। তখন তাঁহার কণ্ঠের

উচ্চারিত প্রাচীন ইংলণ্ডের স্বাধীনতার বাণী তাহাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে সকলেই যুদ্ধার্থ অপ্রস্তুত ছিল —কেবল লর্ড হাল্‌ডেনের প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি-প্রসূত ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র প্রাদেশিক চমূ, এবং লর্ড হার্ডিংয়ের ক্ষিপ্রকারিতায় সুসংবদ্ধ এবং সর্ব্বদা অভিযানের জন্য প্রস্তুত ভারতীয় ফৌজ রণমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র বাহিনা কালক্ষেপের উদ্দেশ্যে এবং অবসর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যুঝিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের হৃদয় রাজধানী প্যারীসের পথে শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য যুঝিতেছিল; এক পদ এক পদ করিয়া পিছু হাটিয়া মুহূর্ত্ত গণিতেছিল। এমন সময় ভারতীয় সেনা ফ্রান্সের ভূমিতে পদার্পণ করিয়া ব্যূহমুখে অগ্রসর হইল, এবং ইংলণ্ডের অবসন্ন সৈনিক-পুরুষদের জয়ধ্বনি-মুখরিত যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইল, ব্রিটিশ-বাহিনীর প্রতিযান (retreat) স্থগিত করিল। অচিরে ইংলণ্ড ও ভারতের মিলিত বাহিনা বিন্যাস-ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া এমন দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিল, যাহার অন্তরালে দুই বৎসর ধরিয়া তাহারা দুরন্ত শীতে (গ্রীষ্ম দেশের অধিবাসী বীরেরা অনেক সময় আবক্ষ তুষার-কর্দ্দমে নিমজ্জিত হইয়া) প্রাণপণে যুঝিয়াছিল, কিন্তু কখনই শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই।

ভারতবর্ষ তাহার সত্যপূত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিল যে, এ যুদ্ধে বৃটনই স্বাধীনতার সারথি, এবং জার্ম্মাণী স্বেচ্ছাচারের সহায়। যদিও ভারতবাসী নিজের দেশে পরাধীন, এবং জার্ম্মাণ স্বেচ্ছাতন্ত্রের অপেক্ষাও কঠোরতর বিধি-নিষেধের-নিগড়ে আবদ্ধ, তথাপি সে ইংলণ্ডের সহযোগি-রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। কারণ, সে বুঝিয়াছিল যে, এ নিগড় un-English অর্থাৎ 'ইংরেজোচিত' নহে, অতএব অস্থায়ী, এই জন্য তাহার অবসান অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য সে জার্ম্মাণীর উৎকোচ অর্থে

পদাঘাত করিয়াছিল, এবং জার্ম্মাণীর বিদ্রোহ-প্ররোচনা অগ্রাহ্য ও ব্যর্থ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ ধন ও জন দিয়া ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল ; শিক্ষিত ভারতবাসী (উকীল প্রভৃতি) স্বেচ্ছাসৈনিক হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের উপহৃত সাহায্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ভারতবাসীর প্রতি এংলো-ইণ্ডিয়ার সতত জাগ্রত অবিশ্বাস এবং অনাস্থা সে সাহায্য অঞ্জলি গ্রাহ্য করে নাই ; অর্থের জন্য শাসকগণ আগ্রহান্বিত ছিল বটে, কিন্তু ভারতবাসীকে সৈন্য-রূপে গ্রহণ করিতে তাহারা পরাঙ্মুখ হইয়াছিল। তাহার ফলে ক্রমশঃ শিক্ষিত ভারতবাসীর আগ্রহ শ্লথ ও মন্দীভূত হইল, এবং তাঁহাদের উৎসাহে অবসাদ আসিল। ফলতঃ এই দুই মহাজাতিকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিবার এমন অমূল্য সুযোগ ব্যর্থ হইয়া গেল।

যুদ্ধারম্ভের কিছু পরে আমি সাহস করিয়া বলিয়াছিলাম যে, যত দিন ইংলণ্ড কৃতনিশ্চয় না হইবেন যে, স্বেচ্ছাতন্ত্র ও আমলা-তন্ত্রের শুধু ইউরোপে নয়—ভারতবর্ষেও অবসান করিতে হইবে, ততদিন যুদ্ধের শেষ হইবে না। কলিকাতার সদাশয় বিশপ মহোদয় স্বাধীন-জাতি-সুলভ সৎসাহসসহকারে সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইউরোপে তাহার ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করা মিথ্যাচারমাত্র। এখন এই ঘোষণা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের লক্ষ্য—স্বরাজ-স্থাপন, এবং অচিরে সেই স্বরাজের বহুলাংশ প্রজা-বর্গকে প্রদান। লক্ষ্ণৌয়ের কন্‌গ্রেস মজলিসে যে সংস্কার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, এবং যাহা ভারতবাসীর ন্যূনতম দাবী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা যখন কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইবে, তখনই ঐ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে, তখনই যুদ্ধের অবসান সমীপবর্ত্তী হইবে। কারণ, স্বেচ্ছাতন্ত্রের ধ্বংসনিনাদ ঘোষিত না হইলে এ যুদ্ধের অবসান নাই।

যুদ্ধ পূর্ব্বের সমর ব্যয়।

স্বীকার করি যে, ভারতবাসীর সহানুভূতির প্রথম উৎসাহ কতক মন্দীভূত হইয়াছে, এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে কেবল তাহার হীনাবস্থার দিকে তাহার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে,—তবে কোন সকল কারণ পরম্পরায় এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা আমি পরে করিতেছি। এই মন্দীভাবের জন্য কিন্তু ভারতবাসী দায়ী নহে। সে যাহা হউক, ভারতবর্ষ যুদ্ধ বিষয়ে যে প্রভূত সাহায্যদান করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার অপলাপ করিবার উপায় নাই। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যুদ্ধারম্ভের বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষ—প্রথমতঃ নিরাপত্তে, এবং ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের পর কংগ্রেসের নিয়ত আপত্তি সত্ত্বেও—সততবর্দ্ধমান সমর-ব্যয়ের ভার বহন করিয়া আসিতেছে। ইহার জন্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের সমবায়-প্রণালী (Amalgamation Scheme), সীমান্তের পারে বিবিধ যুদ্ধের খরচ এবং সর্ব্বদা সঞ্চরমান সীমান্ত-ও-প্রত্যন্তগামী সমরাভিযানই দায়ী। ঐ সকল অভিযানে ভারতবর্ষের কোনও স্বার্থ পুষ্টি হয় নাই। তথাকথিত সাম্রাজ্যিক সুবিধার জন্যই ঐ সকল অভিযানের সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৮৫৯ হইতে ১৯০৪খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৫ বৎসরে ভারতীয় সেনা ৩৭টি যুদ্ধ ও অভিযানে লিপ্ত হইয়াছিল—১০টী যুদ্ধ ও ২৭টী অভিযান। ১৮৬০ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দের দুইটী চীন-যুদ্ধ, ১৮৬৪—৬ খৃষ্টাব্দের ভুটান-যুদ্ধ, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের এবিসিনীয় যুদ্ধ, ১৮৭৮—৯ খৃষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধ, এবং কাবুলে প্রেরিত দূতগণের হত্যার পর ১৮৭৯—৮০ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, এবং তাহার ফলে সতত সঞ্চরণশীল 'বৈজ্ঞানিক' সীমান্তের' অন্বেষণে ভারতের পশ্চিম-সীমান্তের অগ্র-সরণ; (কীন বলেন, এই উপলক্ষে পশ্চিম সীমান্ত সিন্ধুনদের রেখা হইতে সুলিমান পর্ব্বতের

পশ্চিম উপত্যকা, এবং পরে পেশাবার হইতে কোয়েটা অবধি প্রসারিত করা হইয়াছিল); ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মিশরীয় যুদ্ধ, যাহাতে ভারত-বাহিনী বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল; ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় বর্ম্মা যুদ্ধ, যাহার ফলে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর ব্রহ্মদেশ ভারত-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল; ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এবং পুনশ্চ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত-বিজয় —যুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত তালিকা। ক্ষুদ্র যুদ্ধ বা অভিযানের সংখ্যা ২৭। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদ্রতর সাতানা অভিযান, এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বৃহত্তর সীতানা-অভিযান, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে নেপাল ও সিকিম অভিযান; ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সিকিম অভিযান; ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তুমুল রণ, ১৮৭১—২ খৃষ্টাব্দে লুশাইদিগের বিরুদ্ধে অভিযান, ১৮৭৪—৭৫ খৃষ্টাব্দে ডাফলাদিগের বিরুদ্ধে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নাগাদিগের বিরুদ্ধে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আফরীদাদিগের বিরুদ্ধে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রম্পা পার্ব্বতীয়দিগের বিরুদ্ধে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বাজিরি ও নাগাদিগের বিরুদ্ধে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আকাদিগের বিরুদ্ধে, ঐ অব্দেই জোয়াব উপত্যকায় অভিযান, এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ঐ উপত্যকায় দ্বিতীয় অভিযান। ১৮৮৮—৯ খৃষ্টাব্দে পুনশ্চ সিকিমের বিরুদ্ধে অভিযান, কৃষ্ণ-পর্ব্বত অভিযান, এবং উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের পার্ব্বত্য জাতিদিগের বিরুদ্ধে অভিযান, ১৮৯০ অব্দে দ্বিতীয় কৃষ্ণ-পর্ব্বত অভিযান, এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় অভিযান। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মণিপুর যুদ্ধ, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লুশাই যুদ্ধ, এবং মিরানজান-উপত্যকায় অভিযান; ১৮৯৪—৬ খৃষ্টাব্দে চিত্রল অভিযান, এবং ১৮৯৭—৯৮ খৃষ্টাব্দে গুরুতর টিরা-অবরোধ, যাহাতে ৪০০০০ ফৌজ লিপ্ত ছিল। এই দীর্ঘ তালিকা—যাহা আমি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হিসাব করিয়া শেষ করিতেছি, তাহার শেষভাগে সীমান্তে আর তিনটী অভিযান—১৯০১ খৃষ্টাব্দে মাসুদ যুদ্ধ, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কাবুল অভিযান, এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বকথিত তিব্বত অভিযান। এই সকল

ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা সামরিক ব্যয়-বৃদ্ধির কারণ বুঝিতে পারি। এই সঙ্গে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মল্‌টা ও সাইপ্রাসে ভারতসেনা-প্রেরণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা (যাহা কতকটা রঙ্গভূমির অভিনয়ের মত প্রতীত হইয়াছিল) এবং রুষভীতিবারণের জন্য প্রায় ২০০০০০০ পাউণ্ড ব্যয়। এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের অধিকাংশই ভারতের প্রয়োজনে নহে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে আরব্ধ হইয়াছিল, এবং তাহাদের ব্যয়ভার-বহনের বিরুদ্ধে অনেক সময়ে ভারত-গবরমেণ্টই আপত্তি করিয়াছিলেন, যদিও দুই এক জন দুরাকাঙ্ক্ষ বড়লাট কদাচ বা ঐরূপ যুদ্ধে উৎসাহ দিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহাও সম্পূর্ণ নহে।

যে অবধি ভারতের শাসনভার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তচ্যুত হইয়া ইংলণ্ডের রাজশক্তির অধীন হইয়াছে, তদবধি এই ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা সমর-সামগ্রী (asset) ও আখড়া রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থবুদ্ধি ভারতবর্ষকে এই ব্যবহার হইতে অনেকটা রক্ষা করিত; কারণ, কোম্পানীর ইহাই জেদ ছিল যে, তাহার অর্থে পুষ্ট ভারতসেনা ভারতের স্বার্থ ও প্রয়োজন ভিন্ন প্রযুক্ত না হয়।

এইরূপে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারত-বাহিনীর নিয়োগের ফলে কেবল যে ভারতের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হইতেছে, তাহা নয়, ভারতবাসীর আত্ম-সম্মানও বিশেষ খর্ব্ব হইতেছে; কারণ, ভারতীয় সমর-বিভাগে ভারতের যোদ্ধৃজাতিবর্গের স্বাভাবিক যুদ্ধ-প্রবৃত্তি পূর্ব্ববৎ চরিতার্থ হইবার সুযোগ বা অবসর লুপ্ত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, মহারাণী ভারতশাসন অঙ্গীকার করিবার ২০ বৎসর পরেই অস্ত্র-আইন পাস করিয়া সমস্ত জাতিকে নিরস্ত্র করা হইল—তাহার ফল-স্বরূপ ভারতে পঙ্গুত্ব ও ক্লীবত্ব আবির্ভূত হইল, এবং তথাকথিত সমরবিমুখ জাতিদিগকে এবং অতিসমর-প্রমুখ অতএব অবিশ্বাস্য জাতিদিগকে সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করিতে না

দেওয়াতে রংরুট-সংগ্রহের ক্ষেত্র ক্রমশই উত্তরবাহী হইল, এবং তাহার ফলে বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজী—যাহারা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান নির্ভরস্থল ছিল, তাহাদের দৈহিক অবনতি ঘটিতে লাগিল।

এই সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, পঞ্জাবের শ্রেষ্ঠতা—যাহার উপর সার মাইকেল ওডায়ার সেদিন এতটা উৎকট ঝোঁক দিয়াছিলেন, সে শ্রেষ্ঠতা বৃটিশ রাজনীতি ও রাজ্যপ্রণালীর কৃত্রিম ফল, এবং পঞ্জাবের বাহিরে রংরুট-সংগ্রহের চেষ্টার বিফলতা—যাহার সম্বন্ধে তিনি অবজ্ঞাসূচক অত্যুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাও সেই নীতি ও প্রণালীরই ফল, যাহার জন্য বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী ও মারাঠা আজ সৈন্য-বিভাগে বিরল হইয়াছে। বাঙ্গালায় কিন্তু প্রধানতঃ লর্ড কর্জ্জনের কৃত খামখেয়ালি বঙ্গভঙ্গের অসহনীয় অপমানের ফলে আবার রণবীর দেখা দিয়াছে। এ সম্বন্ধে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন—'রাজপুরুষদিগের নির্ম্মম ও অসংযত অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর বীরোচিত অভ্যুত্থানে সমস্ত ভারত চকিত ও পুলকিত হইয়াছে * * সমস্ত ভারতবাসী আজ বাঙ্গালীর নিকট বিশেষভাবে ঋণী।'

এই সন্ধুক্ষিত বীর্য্য বাঙ্গালী যুবকের মধ্যে বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল—যতদিন তাহারা নেতৃবৃন্দের শাসনাধীন ছিল, ততদিন ইহা স্বদেশী ও বয়কটে নিবদ্ধ ছিল; কিন্তু পরে সেই শাসন ছিন্ন হইলে উহা ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা ও ডাকাতীর আকার ধারণ করিল। নব্য ইটালীতে ম্যাটসিনীর সময়ে এবং নব্য রুসিয়ায় ক্রোপটকিন ও ষ্টেপনেকের সময়েও ঐরূপই হইয়াছিল। বাঙ্গালী যুবার আশাভঙ্গ হইতে যে অপরাধের উদ্ভব হইল, অন্যত্র তাহার দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইল ফাঁসী ও দ্বীপান্তর।—তাহার কুফল বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় লর্ড হার্ডিং ও লর্ড কারমাইকেলকে ভুগিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে সুফলও যে ফলে নাই, তাহা নহে। বাঙ্গালী যুবকের স্পৃহনীয়

দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সাহস, যাহা বাঙ্গালার প্রচণ্ড জলপ্লাবনে ও দুর্ভিক্ষ-নিবারণে প্রকট করুণা ও আত্মত্যাগে স্ব-প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা ঐ বীজেরই পরিণত ফল। বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহারা যে সাহায্যদান করিয়াছে এবং করিতেছে—তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বাহক-বাহিনী (Ambulance Corps) সমুদ্রগামী জাহাজডুবির পর নূতন সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া মেসোপটেমিয়ায় অক্লান্তভাবে সেবাদান—সম্মুখযুদ্ধে নিযুক্ত হইবার জন্য ৯০০ সৈনিক লইয়া বাঙ্গালী পল্টন গঠন, এবং অপচয় পূরণ করিবার জন্য আরও ৯০০ রিজার্ভ-রচনা, এবং নব নব রংরুট-সংগ্রহ—ঐ সমস্তের মধ্যেই আমরা ভগবানের মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাই—যাহার দ্বারা তিনি অকল্যাণের ভিতর হইতে কল্যাণকে নিষ্কাষণ করেন, এবং দ্রোহজাত প্রবৃত্তিকে সেবায় নিয়োজিত করেন।

ইংলণ্ডেও আমরা এইরূপ ব্যাপারই লক্ষ্য করিয়াছি। এক জন কয়েদী কারামুক্ত হইয়া 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' অর্জ্জন করিয়াছে। রাজনীতিক অপরাধে বা রাজপুরুষদিগের সন্দেহে যাহারা এখন কারাগারে বা অন্তরীণে আবদ্ধ আছে, এই সময় যদি তাহাদের প্রত্যেককে যুদ্ধক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের সেবা করিবার সুযোগ প্রদত্ত হয়, তবেই যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য করা হইবে, এবং তাহাদের প্রতিও প্রকৃত করুণা প্রদর্শিত হইবে। ইহাদের অধিকাংশই তরুণ যুবক; যদি দরকার মনে হয়, তাহাদের লইয়া স্বতন্ত্র পল্টন গঠিত হউক, এবং তাহাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা হউক, কিন্তু তাহাদিগকে তাহাদের অখ্যাতি ক্ষালন করিবার ঐরূপ অবসর দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এবং অন্যান্য কারণে (ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করিতেছি) ভারতের স্কন্ধে যে দুর্ব্বহ ব্যয়ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে এতটা অপ্রীতি উৎপন্ন হইত না যদি ভারতবাসী নিজে নিজের উপর ঐ ভার চাপাইত, এবং ভারতকে সাম্রাজ্যের যে রণ-শিক্ষার আখড়ায় পরিণত করা

হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভারতবাসী নিজে উপকৃত হইত। কারণ অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের বোঝা বহন করিয়াছে, অথচ সাম্রাজ্যের শক্তি ও স্বাধীনতার ভাগী হইতে পারে নাই।

সে যাহা হউক, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে পরিবর্ত্তনের ফলে ভারতীয় সমর-বিভাগের ব্যয়ভার এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, এবং দুর্ব্বহ হইয়াছে, তাহার নাম—"ব্রিটিশ রিলিফ" প্রণালী। এই প্রণালীর সারমর্ম্ম এই যে, বিলাত হইতে সর্ব্বদা স্বল্প কালের জন্য বিলাতী সৈন্য এ দেশে আনীত হয়, এবং যেমন তাহাদের শিক্ষানবিশী শেষ হয়, অমনই তাহাদিগকে বিলাতে ফেরত পাঠাইয়া অন্য নূতন সৈন্যদল আমদানী করা হয়। তাহার ফলে, ঐ সকল শিক্ষিত সৈন্য-রক্ষার সমুদায় সুবিধা ও লাভ ইংলণ্ড ভোগ করেন এবং তাহাদের শিক্ষা, যাতায়াত ও অন্যান্য সমস্ত ব্যয় ভারতবর্ষকে বহন করিতে হয়। এক কথায় ভারতবর্ষকে বৃটিশ সেনার শিক্ষাক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করা হয়। এ সম্বন্ধে সিমলার সমর সমিতি বলিয়াছেন—"বৃটিশ সমর-বিভাগে সম্প্রতি যে স্বল্পকালিক প্রথা (short-service system) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ফলে এক দিকে ভারতবর্ষের ব্যয়ভার বাড়িয়াছে, অন্য দিকে ভারতপ্রবাসী বৃটিশ সৈন্যের কার্য্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এ কথা আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার সময় ভারতীয় করদাতাদিগের স্বার্থের প্রতি আদৌ দৃষ্টি করা হয় নাই।" এ উক্তি খুব সঙ্গত উক্তি। কারণ এই স্বল্পকালিক প্রথার ফলে ভারতবর্ষ বহু ব্যয়ে সংগৃহীত ও শিক্ষিত বৃটিশ সৈনিকের সেবা বা 'সার্ভিস' ৫ বৎসর মাত্র ভোগ করে—আর যাহা কিছু লাভ ইংলণ্ডেরই হয়। ইহার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ডের 'রিজার্ভ' খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং ভারতের ব্যয়ে সংগৃহীত ও শিক্ষিত সৈনিকের সংখ্যা চারি লক্ষ হইয়াছিল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারত-রক্ষী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১৪০০০০; আর শ্বেতাঙ্গ সেনার সংখ্যা ছিল ৬৫০০০। ১৮৮৫ হইতে ১৯০৫—এই কুড়ি বৎসরের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষে লর্ড কিচনার যখন জঙ্গীলাট হইলেন, তখন তিনি সমর-বিভাগের অনেক সংস্কার করিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, অধিকাংশ সামরিক উপাদান—যাহা ভারতের কারখানায় প্রস্তুত করা উচিত ছিল, এবং যাহা করিলে সমর-সম্ভার-নির্ম্মাণ-ব্যয় দ্বারা ভারত লাভবান্ হইতে পারিত, সেই সমুদায় প্রভূত ব্যয়ে ইংলণ্ড হইতে আমদানী করা হইতেছে। সম্প্রতি যুদ্ধের প্রয়োজন-বশতঃ ভারতীয় কল-কারখানায় গোলাগুলি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে বটে; কিন্তু ইহা বহু পূর্ব্বে আরম্ভ করা উচিত ছিল। ঐরূপ করিলে ভারতের অর্থহানি না হইয়া সমৃদ্ধি হইতে পারিত। এখন যুদ্ধের জন্য বাধ্য হইয়া রাজপুরুষেরা ভারতের খনিজ সম্পদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে ভাল হইত। তাহা না করিয়া জার্ম্মাণীকে ভারতের খনিজ-সম্পদ লুণ্ঠন করিতে দেওয়া হইয়াছিল। ভারতে হোমরুল থাকিলে ভারতবাসী নিজে এই খনিজ-সম্পদে সম্পন্ন হইতে পারিত। ভারতকে সম্পত্তি না ভাবিয়া যদি অংশীদাররূপে স্বীকার করা হইত, তবে ভারতও সমৃদ্ধ হইত, সাম্রাজ্যও নিরাপদ হইত। (ভারতীয় বণিক্‌দিগের জাগরণের প্রসঙ্গে এ বিষয়ের আবার আলোচনা করিব।) এখন যদি আমরা আশা করি যে, যুদ্ধের সময় যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুতের জন্য গবর্মেণ্ট যে সাহায্য দিতেছেন, সন্ধির পর পণ্যসামগ্রী প্রস্তুতের জন্য সেই সাহায্য দিবেন, তবে কি দুরাশা করা হইবে? সে যাহা হউক, সমর-ব্যয়-বৃদ্ধির যে সকল কারণের উল্লেখ করিলাম, তাহার ফলে সমরবিভাগের ব্যয় পরদায় পরদায় বেজায় বাড়িয়া গিয়াছে, এবং যে ক্ষেত্রে ইংলণ্ড ২৮০০০০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিতেছে, সে ক্ষেত্রে ভারতের ব্যয়

২১০০০০০০ পাউণ্ড; কিন্তু কেনেডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মত ধনী রাজ্যে সমর-বিভাগের ব্যয় ১৫ লক্ষ ও ১২॥০ পাউণ্ড মাত্র। (অবশ্য এ কথা অস্বীকার করি না যে, ইংলণ্ড নৌবিভাগের জন্য ৫১০০০০০০ পাউণ্ড বৎসর বৎসর ব্যয় করেন; সে স্থলে ভারতবর্ষের নৌবিভাগের সাহায্যদান ৫ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র।)

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কন্‌গ্রেস এই নিয়ত বর্দ্ধমান সমর-ব্যয়ের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ আপত্তি করিয়াছে, কিন্তু কন্‌গ্রেসের বাণী রাজদ্রোহ ও সম্প্রদায়-বিশেষের দুরাকাঙ্ক্ষার বিজৃম্ভণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অথচ আমরা জানি যে, ভারতীয় প্রজার মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক ও সর্ব্বাপেক্ষা রাজভক্ত, ইহা সেই ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই উক্তি। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম কন্‌গ্রেসে শ্রীযুক্ত পি, রঙ্গিয়া নাইডু দেখাইয়াছিলেন যে, ভারতের সমর-বিভাগের ব্যয়—যাহা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১১৪৬৩০০০ পাউণ্ড ছিল, তাহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বাড়িয়া ১৬৯৭৫৭৫০ পাউণ্ড হইয়াছে। ঐ সময়ে শ্রীযুক্ত ডি, ই, ওয়াচা বলিয়াছিলেন যে, ঐ ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের সমবায় প্রণালী (Amalgamation scheme)। তিনি আরও দেখাইয়াছিলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ কোটী পাউণ্ড মাত্র ব্যয়ে ২৫৪০০০ জন সৈনিক নিয়োগ করিত। কিন্তু মহারাণী ভারত-সাম্রাজ্যের ভার লইবার পর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ১৮১০০০ সৈনিকের জন্য ১১৭০০০০০০ পাউণ্ড ব্যয় পড়িত। এই ব্যয়বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল ইয়ুরোপীয় পল্টনের মহার্ঘতা, নৌ-যাত্রার ব্যয়াধিক্য, এবং সরঞ্জাম, রসদ, পেন্‌সন, ছুটীর ভাতা ইত্যাদি। এই সকল ব্যয়ের অনেক দফা সম্বন্ধেই ভারত গবর্মেণ্ট আপত্তি করিয়াছিলেন, এবং ইহাও অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, ঐ সমবায়প্রণালীজনিত অধিকাংশ খরচ সাধারণ ও সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রয়োজন-ঘটিত, তদ্বিষয়ে ভারতের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা

হয় নাই। এ আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষকে বৎসর বৎসর হোম-ডিপোর জন্য ৭ লক্ষ পাউণ্ড দিতে হইয়াছিল। এ 'হোম' অবশ্য ভারতবর্ষে নয়, ইংলণ্ডে। সেই 'হোমে' বিশ হাজার হইতে বাইশ হাজার বৃটিশ সৈনিক বাস করিত, কিন্তু তাহাদের পল্টন এদেশে থাকিত বলিয়া ঐ সকল হোমের ব্যয় ভারতবর্ষকে দিতে হইত।

ওয়াচা সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় আরও অনেক অবৈধ ব্যয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। কুতূহলী পাঠক তাঁহার সেই সুন্দর বক্তৃতা পাঠ করিতে পারেন।

ফসেট সাহেব একবার বলিয়াছিলেন যে, "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসানের পর ইংরেজ জাতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারতীয় শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আমরা এই দায়িত্ব এমন শ্লথভাবে পালন করিয়াছি যে, অনেক ক্ষেত্রে নূতন শাসনপ্রণালী পুরাতনের তুলনায় অপকৃষ্ট। সে সময়ে ব্যয় বিষয়ে স্বাধীনভাবে নিকাশ লওয়া হইত। এখন সে প্রথা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে।"

মহারাণী সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ করিবার কিছু পরে ডিস্রেলী সাহেব পার্লামেণ্ট সভায় বলিয়াছিলেন যে, "সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ভগবানের অচিন্ত্য বিধানে ভারতের শাসনভার যে ইংরাজ জাতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাকে একটী মহান্ দায়িত্বপূর্ণ ন্যাসস্বরূপ বিবেচনা করা উচিত।" এই উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ৪র্থ কন্‌গ্রেসে জর্জ্জ ইউল সাহেব বলিয়াছিলেন যে, "মনে হয়, যেন পার্লামেণ্টের অল্লাধিক [illegible] জন সভ্য ঐ ন্যাস ন্যাসকর্ত্তা ভগবানের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, ভগবানই যেন তাহার সংরক্ষণ করেন।" বোধ হয়, এমন সময় আসিয়াছে যখন

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, ভগবান্ তাহারই সাহায্য করেন, যে নিজের স্বার্থপুষ্টি নিজের পুরুষকারের দ্বারা করিতে পারে।

বৎসরের পর বৎসর কন্‌গ্রেস সমরবিভাগের ব্যয়-বৃদ্ধির সম্বন্ধে আপত্তি করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের ব্যর্থ প্রতিবাদের পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যখন গোরা সৈনিকের বেতন-বৃদ্ধির ফলে ভারতের সমর-ব্যয় প্রতি বৎসর ৭৮৬০০০ পাউণ্ড বাড়িয়া গেল, তখন কন্‌গ্রেস উহার প্রতিবাদ করিয়া দেখাইলেন যে, যখন দক্ষিণ আফ্রিকা ও চীনদেশে বহুসংখ্যক গোরা সৈন্য পাঠান সত্ত্বেও ভারত নিরাপদ ছিল, তখন নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনে এত অধিক গোরা সৈন্য রাখা হইতেছে। পর বৎসর কন্‌গ্রেস আবার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, ভারতের বর্ত্তমান সমর-ব্যয় ভারতকে অন্তর্বিগ্রহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নয়, পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য-নীতির পরিপুষ্টির জন্য। উপনিবেশসমূহ সাম্রাজ্যের সমর-ব্যয়ে অতি অল্পই সাহায্য করে। কিন্তু ভারতবর্ষ শুধু ভারতীয় সৈনিকের নয়, বৃটিশ সেনারও প্রায় এক তৃতীয়াংশের গুরু ব্যয়ভার বহন করিতেছে। সাম্রাজ্যের সমর-প্রয়োজনে ভারতের সাহায্যের যখন পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হয়, তখন এই সব কথা স্মরণ রাখা উচিত।

১৯০৪ ও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কন্‌গ্রেস বলিয়াছিলেন যে, ভারত তখনকার সামরিক ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষম, এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই আবেদন করিয়াছিলেন যে, লর্ড কিচেনারের সংস্কার-প্রণালীর প্রয়োজনে যে এক কোটী পাউণ্ড মঞ্জুর করা হইয়াছিল, তাহা শিক্ষার জন্য এবং রায়তদিগের ভার-লাঘবের জন্য ব্যয় করা হউক।

বৃটিশ সমর আফিস ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের স্কন্ধে যে ব্যয়ভার চাপাইয়া আসিতেছিলেন, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কন্‌গ্রেস তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, ভারত-

রাজস্বের প্রায় একতৃতীয়াংশ সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় করা হইতেছে, এবং তাহার ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে রিক্ত রাখা হইতেছে।

লর্ড কিচেনারের সংস্কার-প্রণালীর ফলে ভারতসেনাকে অহরহ অভিযানের জন্য প্রস্তুত রাখা হইত, এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ঐরূপ প্রস্তুত সেনার সংখ্যা ছিল—৭৫ হাজার গোরা সৈন্য সমেত মোট ২৪৭০০০। যেহেতু ভারতবর্ষ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বহু অর্থব্যয়ে ভারতের সেনাকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত রাখিয়াছিল, সেই জন্যই যুদ্ধের সূচনাকালে ফ্রান্সে বৃটিশ সেনার সঙ্কটসময়ে ভারত গবর্মেণ্ট পূর্ব্বোক্তরূপ সাহায্য-প্রেরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯১৪।১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের সমর-ব্যয় ছিল ২০০০০০০০ পাউণ্ড। ১৯১৫।১৬ খৃষ্টাব্দে ঐ ব্যয়ের অঙ্ক ২১২৫০০০০ পাউণ্ড ও ১৯১৬।১৭ খৃষ্টাব্দের বজেটে ২২০০০০০০ পাউণ্ড মঞ্জুর হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও কুলাইবে না।

এই অতিরিক্ত ব্যয় সম্বন্ধে বড় লাট যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ভয়ের কারণ আছে। ভারতীয় সমর-ঋণের জন্য (ইংলণ্ডে প্রাপ্ত ট্রেজারী বিল বাদে) অন্যূন ৩২০০০০০০ পাউণ্ড ইতিমধ্যেই আদায় হইয়াছে—আরও আদায় হইতেছে। এই সমর-ঋণের টাকা বিলাতে পাঠান হইতেছে। ইহা ভারতের প্রতিশ্রুত ১০০০০০০০০ পাউণ্ড বিশেষ সাহায্যের অংশমাত্র। বৃটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষে ভারতে ও মেসোপোটেমিয়ায় যে সব সামরিক খরচ হইতেছে, সমর-ঋণের টাকা তাহাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বড়লাট বলিয়াছেন—"ভারতের সমর-ব্যয় বজেটের নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। বজেটের অঙ্ক, তখন অবধি যতদূর জানা ছিল, তাহার অনুপাতে ধরা হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, ফাজিল ব্যয়ে কেবল যে বজেটের খাতে এক কোটী পাউণ্ড ব্যয়িত হইবে তাহা নহে; তাহার উপর এ পর্য্যন্ত সমর-ঋণ দ্বারা লব্ধ সমস্ত অর্থই নিঃশেষিত

হইবে। ভারতবর্ষই বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রাচীস্থ অর্থকেন্দ্র। এই হেতু ভারতের ও মেসোপটেমিয়ার সমর-ব্যয় ছাড়া ইংলণ্ড, উপনিবেশ, এবং মিত্ররাজ্যসমূহকে ভারতবর্ষ যে গম, পাট, চামড়া ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতেছে, তাহার বাবদে ভারতকেই টাকা আমানত করিতে হইতেছে। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্ব-আফ্রিকা ও পারস্য দেশকেও প্রচুরপরিমাণে অর্থ যোগাইতে হইতেছে, এবং কয়েকবার সিংহল, মারীচ-দ্বীপ ও মিশরেও মুদ্রা ও অন্যান্য দ্রব্য পাঠাইতে হইয়াছে। অবশ্য এ সব সাহায্য আমরা বিনামূল্যে দিতেছি না। কিন্তু সে মূল্যের টাকা যখন ভারতে আমদানী হইতেছে না, তখন তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদের বর্ত্তমান পুঁজীর অপচয়।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্যয়ের অঙ্কে যাহা ফাজিল হইবে, প্রচলিত করের দ্বারা কিছুতেই সেই ফাজিলের পূরণ করিতে পারা যাইবে না। অতএব নূতন ট্যাক্‌স নিশ্চিত বসিবে। এই ট্যাক্‌স কাহার উপর বসিবে? অসম্ভব নয় যে, যে সকল জমীদার সরকারী ও বেসরকারী শ্বেতাঙ্গের সহিত হৃদ্যতা করিয়া স্বদেশের বিপক্ষতা করিতেছেন, তাঁহারা ঐ সকল নূতন বান্ধবের আচরণে ভগ্নাশ হইবেন, এবং জাতীয় আয়-ব্যয়ের উপর জাতীয় প্রতিনিধিসভার (যেখানে তাঁহাদের প্রতিনিধিগণও যথাযোগ্য আসন পাইবেন) অধিকার, থাকা উচিত, ইহা তাঁহারা ঠেকিয়া শিখিয়া বুঝিবেন।

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড হার্ডিং (ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদার সহানুভূতির জন্য যাঁহার স্মৃতি এ দেশে সম্মানিত রহিয়াছে) বিগত ৩রা জুলাই পার্লামেণ্টের লর্ড-সভায় বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের সাহায্যদান সম্বন্ধে চমৎকার বিবরণ বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধের পূর্ব্বকালীন ভারতের সামরিক ব্যয়ের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, 'নিকলসন' কমিটীর নির্দ্দেশানুসারে বার্ষিক ১৯২৫০০০০ পাউণ্ড

ভারতীয় সমর-ব্যয়ের সর্ব্বোচ্চ হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎপরে ১৩ বৎসরের মধ্যে ১১ বৎসর ভারতবর্ষ ঐ অঙ্কের অতিরিক্ত খরচ করিয়াছিল, এবং তাঁহার শাসনের শেষ বৎসরের বজেটে ঐ ব্যয়ের হার ২২০০০০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ঐ ১০ বৎসরের আয়ের অঙ্ক ৪৮০০০০০০ হইতে ৫৮০০০০০০ পাউণ্ডের বেশী ছিল না—কেবল এক বৎসর ৬ কোটী হইয়াছিল। এইবার ভারতের মোট আয়ের অনুপাতে সমর-ব্যয়ের পরিমাণ কর, তবেই ভারতবর্ষ যুদ্ধে কতটা ত্যাগস্বীকার করিয়াছে, কতটা টাকা যোগাইয়াছে তাহার পরিমাণ ও প্রমাণ জানিতে পারিবে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরব্ধ হয়। ঐ মাসে ও সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ হইতে তিনটি 'ডিবিসান' (দুইটি পদাতিক সৈন্যের ও একটি অশ্বারোহী সৈন্যের ডিভিসান,) ফ্রান্সে প্রেরিত হইল। নভেম্বর মাসে অশ্বারোহী সৈন্যের আর একটি 'ডিভিসান' তাহাদের সহিত যোগ দিল। লর্ড হার্ডিংয়ের ভাষায়, 'প্রথমোক্ত সৈনিকগণ বৃটিশ-বাহিনীর যে শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছিল, অন্য কেহ তাহার পূরণ করিতে পারিত না।' লর্ড হার্ডিং খেদের সহিত বলিয়াছিলেন—'সেই বীর পদাতিক সৈন্যের অল্পমাত্রই জীবিত আছে।' সত্যই তাহাদের গৃহদ্বার আজ শূন্য; কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্য তাহারা ফ্রান্সে প্রাণপাত করিয়াছে, তাহাদের বংশধরগণ সে স্বাধীনতা নিশ্চয়ই ভোগ করিবে। ভারতের সীমান্ত-রক্ষার জন্য আর তিনটি ডিভিসান অচিরে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং ঐ সেপ্টেম্বর মাসে এক মিশ্র ডিভিসান পূর্ব্ব-আফ্রিকায়, এবং অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আর দুইটি 'ডিভিসান' ও একটী অশ্বারোহী 'ব্রিগেড' মিশরে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে এক ব্যাটালিয়ন ভারতীয় পদাতিক মারীচদ্বীপে, আর এক ব্যাটালিয়ন ক্যামিরুনে এবং দুইটি ব্যাটালিয়ন পারস্য-উপসাগরে প্রেরিত হইয়াছিল। এ দিকে অন্য অন্য সৈন্যেরা

সিংটাউ অবরোধে জাপানীদিগের সহায়তা করিয়াছিল। এইরূপে ২১০০০০ ভারত-সৈনিক সমুদ্রপারে প্রেরিত হইয়াছিল। এই সমস্ত সৈন্যের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ভারতবর্ষ যোগাইয়াছিল। তা ছাড়া যুদ্ধের প্রথম কয় সপ্তাহে ভারতীয় অস্ত্রাগার হইতে ৭ কোটী টোটা, ৬০০০০ বন্দুক ও ৫৫০ এরও অধিক অতি উৎকৃষ্ট কামান ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল।

লর্ড হার্ডিং বলেন যে, 'ইহা ব্যতীত প্রচুরপরিমাণ সরঞ্জাম অর্থাৎ তাঁবু, বুট, জিন, পোষাক ইত্যাদিও ভারত হইতে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং বিলাতের সমর আফিসের নিত্য নূতন আব্দার যোগাইবার পক্ষে চেষ্টার কোনও ত্রুটী হয় নাই। মোটের উপর এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, যুদ্ধ-ঘোষণার পর প্রথম কয় সপ্তাহ ভারতবর্ষকে নিঃশেষে দোহন করা হইয়াছিল।' যদিচ লর্ড হার্ডিং এ কথা ধরেন নাই, কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধে যেমন যেমন সৈন্যক্ষয় হইয়াছে, অমনই তাহাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করা হইয়াছে; সেই পূরণকারী সৈন্যের সংখ্যা ৪৫০০০০। নূতন রংরুট ও অন্যান্য সৈন্যের গণনা করিলে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের শেষ অবধি অন্যূন ১০ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য বর্ত্তমান যুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। তা' ছাড়া ভারতের ব্যয়ে শিক্ষিত ও সজ্জিত ৮০০০০ গোরা সৈন্য ভারত হইতে যুদ্ধস্থলে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার বিনিময়ে কয়েক মাস পরে ৩৪টি টেরিটোরিয়্যাল ব্যাটেলিয়ন ও ২৯টি ব্যাটারী ভারতবর্ষকে দেওয়া হইয়াছিল। ইহাদের 'সাজসজ্জা ও অস্ত্র-শস্ত্র সংস্কৃত হইলে পর, এবং শিক্ষানবীশদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে পর, তবে তাহারা ভারত-সীমান্তে, কিংবা মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়।'

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শরৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষ

পর্য্যন্ত ভারত-সীমান্তের রক্ষাকার্য্যও সুকর ও শঙ্কাশূন্য ব্যাপার ছিল না। এ সম্বন্ধে লর্ড হার্ডিং বলিয়াছেন—'অনেকদিন পর্য্যন্ত আফগানিস্থানের ভাব অনিশ্চিত ছিল; যদিও আমি আমাদের মিত্ররাজ আমীরের ব্যক্তিগত সততা সম্বন্ধে কখনও সন্দিহান ছিলাম না, কিন্তু আমার ভয় ছিল, পাছে পার্ব্বত্য জাতিদিগের মধ্যে জিহাদের প্রচার সফল হইয়া, কিংবা আফগান প্রজার মধ্যে ধর্ম্মান্ধতার ঢেউ উঠিয়া আমীরকে বিপ্লুত করে। * * এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে স্থলে যুদ্ধের পূর্ব্বে তিন বৎসরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উল্লেখযোগ্য কোনও বিগ্রহ হয় নাই, সেই স্থলে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঐ প্রদেশে ৭টি গুরুতর আক্রমণ ব্যাহত করিতে হইয়াছিল।' ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এবং শেষে সমর-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে দুইটি জার্ম্মাণ ষড়যন্ত্রের প্রতীকার করিতে হইয়াছিল—প্রথমতঃ ক্যানেডা ও মার্কিণ দেশ হইতে ৭০০০ লোক পঞ্জাবের কয়েকটি ঘাঁটি হঠাৎ অধিকার করিবার সংকল্পে ভারতবর্ষে উপনীত হয়। পরে ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালা প্রদেশে আর একটি জার্ম্মাণ ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, এবং তাহার জন্য স্থলে সৈন্য চালনা ও জলে বন্দররক্ষার আয়োজন করিতে হইয়াছিল।

লর্ড হার্ডিংকে বিলাতের ও এ দেশের টোরী ও ইউনিয়ানিষ্ট সংবাদ-পত্র-কৃত তীব্র আক্রমণ সহিতে হইয়াছে—বিলাতে মেসোপটেমিয়া-সমিতির মন্তব্যের জন্য, এবং এ দেশে ভারতবাসীর পক্ষসমর্থন-জনিত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বিদ্বেষের জন্য। ভারতবাসী কিন্তু তাঁহার প্রতি নিজেদের শ্রদ্ধাবিশ্বাস লিপিবদ্ধ করিয়াছে। লর্ড হার্ডিং ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন।

মেসোপটেমিয়া-সমিতি-কৃত ভারত-প্রচলিত আমলা-তন্ত্রের নিন্দাবাদের এ স্থলে আলোচনা নাই করিলাম। লর্ড হার্ডিং নিজের ও ভারতের কলঙ্কভঞ্জন করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই আমলা-তন্ত্রেব ক্ষালন করিতে পারে নাই। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা মন্দ নয় যে, ১৮৭৮—৯ ও ১৮৭৯—৮০ খৃষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধে আমলা-তন্ত্রের অসারতা আরও চমৎকার-রূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্ভাবিত সমর-ব্যয় ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী হইবে না, এইরূপ স্থির করা হইয়াছিল; এবং বজেটে ব্যয়ের উপর ফাজিল আয় ২০ লক্ষ পাউণ্ড ধরা হইয়াছিল! ঐ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল ভারত গবর্মেণ্ট সংবাদ দিলেন যে, 'সমর-ব্যয় বড় ভীতিপ্রদ—বজেটে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অনেক অধিক।' ১৩ই এপ্রেল শুনা গেল যে, তিন মাসের মধ্যে অত্যধিক সমর-ব্যয় জন্য ফাজিল তহবিল ১৩ কোটী হইতে ৯ কোটীর নীচে নামিয়াছে।' পরে ২২শে এপ্রেল লাট সাহেবের নিকট সংবাদ আসিল যে, 'ফাজিল ত দূরের কথা, অন্যূন ৫½ কোটী টাকা ঘাট্‌তি পড়িতেছে।' ঐ প্রকাণ্ড ভুলটা সমরজনিত দেনার অঙ্ক কম করিয়া ধরায় ঘটিয়া গিয়াছিল, এবং সেই জন্য পার্লামেণ্ট সভাকে অতটা বিভ্রান্ত করা হইয়াছিল, এবং নিয়মিত খরচের ভার বহন করিবার অক্ষমতা হঠাৎ ধরা পড়িয়াছিল।' দেখা গিয়াছিল যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা জানিতেন না —আয়-ব্যয়-পরীক্ষার কাগজে কত অঙ্ক ফেলা ছিল, তাহাই জানিতেন! ব্যয়ের অঙ্ক 'আমানত' বলিয়া লিখিত হইয়াছিল; যদিচ এই আমানত-আদায়ের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। পরে প্রকাশ হইল যে, হিসাব-বিভাগের কর্ত্তাদিগের অনবধানতায় ঐ ত্রুটী ঘটিয়াছিল। এ দেশে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার পর—ভগবান্ না করুন—যদি ঐরূপ একটা দুর্ঘটনা ঘটে, তবে ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগের লোমহর্ষণ অযোগ্যতার প্রতি তখনকার

"ইংলিশম্যান" ও "মান্দ্রাজ মেল" যে কঠোর কটাক্ষ করিবেন, তাহা ভাবিতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়!

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্‌সফোর্ড পরবর্ত্তী নিন্দুকদিগের আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। এই সকল নিন্দুকদিগের আশঙ্কা এই যে, পাছে ভারতের সাহায্যের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হইলে ইংলণ্ডকে কৃতজ্ঞতায় পড়িতে হয়, পাছে তাহার ফলে ভারতের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করিতে গিয়া ভারতকে স্বারাজ্যের অধিকার দিতে হয়! লড চেম্‌সফোর্ড অতি সংযত ভাষায় তাঁহার ব্যবস্থাপক-সভার সমক্ষে বিগত দুই বৎসরে ভারতবর্ষ যুদ্ধ সম্বন্ধে কি কি সাহায্য দিয়াছে, তাহার বিবৃতি করিয়াছিলেন। লর্ড হার্ডিংয়ের আমলের প্রসঙ্গ বাদ দিয়া আমি তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।—'যখন যুদ্ধ বাধে, তখন ভারতীয় সৈন্যবিভাগের ৪৫৯৮ জন গোরা অফিসারের মধ্যে ৫০৩ জন ছুটী লইয়া বিলাতে ছিল। ইংলণ্ডের সমর-আফিস তাহাদিগকে য়ুরোপেই যুদ্ধার্থ রাখিয়া দিলেন। তাহা ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণার পর ভারতবর্ষ হইতে আজ পর্য্যন্ত ২৬০০ জন রণ-সামর্থ্যসম্পন্ন অফিসারকে টানিয়া লইলেন। এ গণনায় যাহারা নিজ নিজ ব্যাটারী বা সৈন্যদিগের সহিত বিদেশে যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের ধরা হইল না। এই ঘাট্‌তিও যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী অপচয় পূরণ করিবার জন্য ভারতীয় সৈন্যের সেনাধ্যক্ষের রিজার্ভ, যাহা ৪ঠা অগষ্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৪০ জন মাত্র ছিল, তাহা বাড়াইয়া ৩০০০ হাজার করা হইয়াছে। ভারতীয় সৈনিকের সংখ্যার হ্রাস ত করা হয়ই নাই, বরং অনেক বাড়ান হইয়াছে। অশ্বারোহীর সংখ্যা শতকরা ২০ জন, এবং পদাতিকের সংখ্যা শতকরা ৪০ জন বাড়িয়াছে, এবং যুদ্ধারম্ভের পর যে সকল রংরুট সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অগষ্ট সমস্ত ভারত-সৈন্যের যে সংখ্যা ছিল, তদপেক্ষা বেশী।"

লর্ড চেমস্‌ফোর্ড যথার্থই বলিয়াছেন—"অতএব প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতীয় ফৌজ সাম্রাজ্যের এক প্রধান অবলম্বন ও সম্বল (asset)। যখন যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সাহায্যের তৌল করা হইবে, তখন যেন এ কথা মনে রাখা হয় যে, ভারতীয় ফৌজ একটা হঠাৎ-সৃষ্ট ব্যাপার নয়; কিন্তু সুচির-কালকলিত সুশিক্ষিত সুসজ্জিত বাহিনী। এই ফৌজ প্রস্তুত রাখিবার জন্য ভারতবর্ষকে অনেক কাল ধরিয়া বৎসর বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল।"

লর্ড চেমস্‌ফোর্ড সম্প্রতি একটা জনশক্তি-সমিতি (Man power Board) গঠিত করিয়াছেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ভারতীয় জনশক্তি-সংগ্রহের উপযোগী সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা। সকল প্রদেশে ইহার শাখা গঠিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহমুখে সৈন্যের যে অপচয় হইতেছে অবিলম্বে নূতন সৈন্য দ্বারা তাহার পূর্ত্তি করা হইতেছে; এবং মজুর, চালক, বাহক প্রভৃতি কুলী সংগ্রহ করিয়া মেসোপোটেমিয়ায় ২০টী এবং ফ্রান্সে ২৫টী 'গণ' (corps) গঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ৬০০০০ হাজার কারুকর, শ্রমজীবী, বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি মেসোপোটেমিয়ায় ও পূর্ব্ব-আফ্রিকায় নিযুক্ত হইয়াছে, এবং কুড়ি হাজার ব্যক্তি ভৃত্য-রূপে সমুদ্রপারে গিয়াছে। প্রায় ৫০০ শত ভারতীয় চিকিৎসক ভারতীয় চিকিৎসা-বিভাগে কমিশন গ্রহণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের এ সময়ে নাকি বিশেষ জরুরী প্রয়োজন, তাই এই ভাবে কমিশন দেওয়া হইয়াছে। যখন দেওয়াই হইয়াছে, তখন আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, যুদ্ধের সময় যেমন, শান্তির সময়েও তেমনই ভারতীয় চিকিৎসককে সাদরে গ্রহণ করা হইবে, এবং বিলাতী ডিগ্রীর অভাবকে কমিশন মন্দিরে প্রবেশের অন্তরায়-রূপে স্থাপন করা হইবে না? ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জিলাস্থ সিবিল-সার্জ্জনের স্থান অনেক স্থলে ভারতীয় ডাক্তার-

গণ গ্রহণ করিয়াছেন। যুদ্ধের পর যেন এ ব্যাপারে অন্যথা না করা হয়। রিজার্ভভুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষের সংখ্যা যখন ৪০ হইতে তিন হাজার বর্দ্ধিত হইয়াছে, তখন এরূপ ভাবা কি অসঙ্গত যে, উপযুক্ত ভারতবাসীর পক্ষে সম্রাটের কমিশন-প্রাপ্ত সেনানায়ক হইবার অধিকার ৯টি মাত্রে সীমাবদ্ধ রাখা অসঙ্গত ? যদি ১৯।২০ বৎসরের ইংরেজ বালক সম্রাটের কমিশন পাইবার যোগ্য হয় (মৃত দ্বিতীয় লেপ্টেনেণ্টের তালিকা দেখিলে এই কথা সপ্রমাণ হইবে) তাহা হইলে যখন ভারতীয় ফৌজ ইংরেজ সৈন্যের অনুরূপ সমান সাহসে যুঝিতেছে, কেন তখন ভারতীয় যুবকের পক্ষে নিজের দেশে সম্রাটের কমিশন পাইবার অধিকার অপাবৃত হইবে না ? এবং ভারতীয় সেনাধ্যক্ষের অধীনে ভারতীয় ফৌজ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবে না ?

ভারতবাসীর যুদ্ধে সহায়তার যে চিত্র আমি অক্ষম-তূলিতে অঙ্কিত করিলাম, ইহার পর ভারতবাসীর কৃত ইংলণ্ড ও অন্যান্য মিত্র-রাজ্যের পক্ষ-সমর্থনের বিষয় আর অধিক কি বলিবার আছে ? ভারতবর্ষ যে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করে, এবং ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিবার অভিলাষী, এ কথা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ড যদি ভারতীয় জনশক্তির সম্যক্ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন (এবং লর্ড চেমস্-ফোর্ডের অনুষ্ঠিত জন-শক্তি-সমিতির উদ্দেশ্যও ইহাই) তাহা হইলে, ভারতীয় জনগণের স্বদেশে মনুষ্য-ভোগ্য অধিকার থাকা আবশ্যক। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রধান শিক্ষাই এই যে, যদি সাম্রাজ্যকে নিরাপদ করিতে হয়, তবে ভারতবর্ষকে হোমরুল দিতেই হইবে। যদি যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের জনশক্তির প্রকৃষ্ট প্রয়োগ করা হইত, তবে বোধ হয় যুদ্ধই বাধিত না। কারণ, কাহার এত সাহস যে ইংলণ্ড ও ভারতের সংযুক্ত শক্তিকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করে। কিন্তু যতদিন ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ এবং ভারতবাসী পরাধীন প্রজার জাতি থাকিবে, ততদিন তাহার জনশক্তির

প্রকৃষ্ট প্রয়োগ সম্ভবপর হইবে না। ভারতবর্ষ কিরূপে একটা বিপুল সেনার ব্যয়ভার বহন করিবে, যদি সেই সঙ্গে তাহাকে গোরা সৈন্যের ব্যয়, তাহাদের যাতায়াতের ব্যয়, বিলাতে উচ্চদরে সরঞ্জাম-খরিদের ব্যয়, এবং ইংলণ্ডের প্রয়োজন হইলে সেই সরঞ্জাম রপ্তানী করিবার ব্যয় বহন করিতে হয়? ভারতবর্ষের পক্ষে ইংলণ্ডে গোরা সৈন্যের শিক্ষানবিশীর ব্যয়-ভার বহন করা যুক্তিসঙ্গত নহে—বিশেষতঃ যখন সেই সকল সৈনিক ৫ বৎসরের অধিক ভারতবর্ষে থাকে না। ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে যে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডে মোহরের বিপুল কাঁড়ি জমাইয়া রাখিবে, এবং নিজে অর্থকৃচ্ছে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের করাধিক্য-জাত কষ্টসঞ্চয় হইতে যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ২৭০০০০০০ পাউণ্ড কর্জ্জ দান করিবে। স্মরণ রাখিবেন যে, এ কর্জ্জদান বৃহৎ সমর-ঋণ-আদানের পূর্ব্বের ঘটনা। আমি একবার বিলাতে বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, যদি ভারতের রাজভক্তি চাও, তবে ভারতকে স্বাধীন কর। আজ আরও বলিতে চাই যে, যদি ভারতকে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে লাগাইতে চাও, তবে ভারতবাসীকে স্বাধীন কর। ভারতবাসী যখন দেখিবে যে, ভারতীয় করজাত অর্থ ভারতবর্ষেই থাকে, এবং ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে, ভারতবাসীর শিক্ষায় ও তাহাদিগের শক্তির উপকর্ষের জন্য ব্যয়িত হয়, এবং তাহার বাণিজ্যের উন্নতিতে এবং নব নব শিল্পের উদ্ভাবনে নিয়োজিত হয়, তখন ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় নিজের উপর ব্যয়-ভার স্থাপন করিবে। শান্তিতে সমৃদ্ধিলাভ এবং যুদ্ধে আপদ্ উদ্ধার জন্য ভারত-বর্ষের যেমন ইংলণ্ডকে প্রয়োজন, তেমনই ইংণ্ডের ভারতবর্ষকে প্রয়োজন। মণ্টেগু সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন যে, যুদ্ধকালে রণসজ্জার জন্য শান্তিকালে স্বাধীনতার প্রয়োজন। অতএব বলিতে চাই যে, ইংলণ্ড ও ভারত দুই দেশের পক্ষেই ইয়োরোপের মহারণ হইতে এই শিক্ষালাভ হইল—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইল যে, ভারতবর্ষকে অতঃপর হোমরুল দিতে হইবে।

অবশেষে এই সভায় সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীর শ্রদ্ধাপূর্ণ রাজভক্তি মহামান্য সম্রাটের সিংহাসনতলে উপহার দিয়া এই প্রসঙ্গের অবসান করিতেছি। আমাদের নিশ্চিত আশা ও বিশ্বাস এই যে, অচিরে স্বরাজ্য-মণ্ডিত এই মহাজাতির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার চরণে উপহৃত হইবে।

ভারতীয় নবজাগরণের নিদান।

ভারতে নবজাগরণের ঊষা যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ করিবার অবসর নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনজনিত ভাব-বিনিময়, ইংরাজী শিক্ষা সাহিত্য ও আদর্শের প্রভাব, ইয়ুরোপ, জাপান এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ভ্রমণের ফল প্রভৃতি যে সকল পরিজ্ঞাত কারণ এ সম্বন্ধে কার্য্য করিয়াছে, এ স্থলে তাহার বিস্তার করিব না। কিন্তু তদ্ব্যতীত যে কয়েকটী বিশিষ্ট শক্তি কার্য্যকরী হইয়া ভারতবর্ষে এই যুগপরিবর্ত্তন ও নবীন ভাবের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিব।

(ক) প্রথমতঃ এশিয়ার উদ্বোধন,

(খ) বিদেশী শাসন ও সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা।

(গ) শ্বেতাঙ্গ জাতিদিগের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বিশ্বাস হানি।

(ঘ) বণিক্‌দিগের জাগরণ।

(ঙ) নারীদিগের প্রাচীন স্থান অধিকারের চেষ্টা।

(চ) জনসাধারণের সুপ্তিভঙ্গ।

ভারতীয় জাতির মধ্যে যে মহনীয় ভাব-বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইতেছে, যে দেশাত্মবোধ উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে, যে স্বাতন্ত্র্য, স্বাবলম্বন, আত্মমর্য্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে, উল্লিখিত প্রত্যেকটি তাহার সহকারী

কারণ। যুদ্ধের ফলে জগতের ভাব-বিকাশক্রম সর্ব্বত্রই দ্রুততর হইয়াছে; কিন্তু আমাদের জন্মভূমি যতটা এই অনুপ্রাণনা অনুভব করিয়াছেন, আর কোনও দেশ ততটা করে নাই।

(ক) এশিয়ায় উদ্বোধন ঃ—

লর্ড মিণ্টো রাজপ্রতিনিধি হইয়া এ দেশে আসিবার অল্পদিন পরে তাঁহার সঙ্গে ভারতের অশান্তি সম্বন্ধে আমার আলোচনা হইয়াছিল। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ঐ অশান্তি ইংরাজী শিক্ষার ও ইংরাজী গণতন্ত্রের আদর্শ, জাপানের হস্তে রুষের পরাজয় এবং বহির্জগতের পরিবর্ত্তন-পরম্পরার অবশ্যম্ভাবী ফল। সেই জন্য লর্ড মিণ্টো যখন প্রকাশ্য ভাবে ও স্পষ্টভাষায় বলিলেন যে, ভারতবাসীর হৃদয়ে যে নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা সমস্ত প্রাচ্যের বিরাটতর ভাব-পরিস্পন্দের ব্যঞ্জনামাত্র এবং শাসন-কার্য্যে ভারতবাসীকে অধিকতর ভাগী করিয়া ঐ আশা আকাঙ্ক্ষার পূরণ করা আবশ্যক, তখন আমি বিস্মিত হই নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতের মধ্যে যে প্রেরণা দৃষ্ট হইতেছে, যদি ইহাকে প্রাচীর জাগরণের অঙ্গমাত্র বলিয়া মনে করা যায়, তবে বুঝিতে ভুল করা হইবে। এশিয়ার জাগরণ জাগতিক উদ্বোধনের একাংশ। এই উদ্বোধন এই জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের ফলে অত্যাশ্চর্য্য গতি লাভ করিয়াছে। জগতের গতি এখন গণতন্ত্রের অভিমুখে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন আমেরিকার উপনিবেশসমূহ ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন ঐ ব্যাপারে এই গতির আরম্ভ, এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসীবিপ্লবে ইহার পরিণতি। বলা বাহুল্য যে, ইহার মূলে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি, রুঁষো, টমাস পেইন ও ফরাসী বিশ্বকোষ-কর্ত্তাদিগের চেষ্টায় ইয়ুরোপের মানসিক দাসত্বের অপনোদন। প্রাচ্যে, জাপানে দ্রুততর পরিবর্ত্তন এবং

রুষিয়ার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ, চীনে মাঞ্চু রাজবংশের অধঃপতন এবং চীনদেশে গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, পারস্যের অভ্যুদয়প্রযত্ন (যাহা রুষিয়া ও ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপে এবং প্রভাবকেন্দ্রের (spheres of influence) স্থাপন দ্বারা ব্যাহত হইয়াছিল, এবং পারস্যের ন্যায্য স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়াছিল) এবং সর্ব্বশেষে রুষ রাজ্যবিপ্লব এবং ইয়ুরোপ ও এশিয়ায় রুসীয় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা—এই সমস্ত মিলিত হইয়া ভারতের পূর্ব্বতন ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। ভারতবাসী এখন হিমালয়ের পর-পারে এশিয়ার বক্ষের উপর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতিসমূহের বিস্তার লক্ষ্য করিতেছে। স্বেচ্ছাচারী জার বা চীন সম্রাটের বিপুলরাজ্যদেশ এখন আর ভারতের প্রতিবাসী নহে। ভারত এখন আর এই সকল অত্যাচার-পীড়িত জাতিসমূহের দুরবস্থার সহিত নিজের সৌভাগ্যের তুলনা করে না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (যখনও এদেশে স্বেচ্ছাচার প্রবল হয় নাই) ভারত-বর্ষ প্রতিবেশী দেশের তুলনায় সৌভাগ্যশালী ছিল। কিন্তু এখন হইতে যতদিন না ভারতবর্ষে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হয়, ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসী প্রতিবেশীদিগের অবস্থায় ঈর্ষ্যান্বিত হইবে, এবং তাহাদের অবস্থার সহিত তুলনা ভারতের অশান্তিকে প্রবলতর করিবে।

কিন্তু যদি ভারতবর্ষ স্বারাজ্য লাভ করে, (আমি বিশ্বাস করি, ইহা সুনিশ্চিত) তাহা হইলে সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষ যে স্থান অধিকার করিবে, সেই স্থান অধিকার করিয়া ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী আভ্যন্তরীন শাসন সম্বন্ধে কেবল স্বতন্ত্র হইলেই চলিবে না, তাহাকে সবল হইতে হইবে। কারণ, এশিয়ার অন্য শক্তিপুঞ্জের যেমন যেমন আকাঙ্ক্ষা ও বিরোধ বৃদ্ধি পাইবে, তেমনই ভারতবর্ষ যে কেবল সাম্রাজ্যের মধ্যে দুর্ভেদ্য গ্রন্থি থাকিবে, তাহা নহে, ভারতের প্রতি অন্য সকল জাতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে। ইয়াং সাহেব এক সময়ে বলিয়াছিলেন, যে ভারতবর্ষ

ইংলণ্ডের দুগ্ধবতী গাভী—এক কথায় কামধেনু। এশিয়ার মধ্যে যদি ঐ ধারণা প্রবল হয়, তবে কে জানে—প্রাচীন কালে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে কামধেনু লইয়া যেরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষের স্বামিত্ব লইয়া পরে বিবাদ না ঘটিবে। অতএব, কি স্থলপথ কি জলপথ, উভয় পথে ভারতের আত্মরক্ষায় সমর্থ হওয়া আবশ্যক। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী বিরোধের কথা নাই বলিলাম, (যদিও দেখিতেছি, জাপান ইতিমধ্যেই ভারতীয় ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সঙ্কটদশা করিয়া তুলিতেছে, যেহেতু ভারত আত্মরক্ষায় অসমর্থ) কিন্তু এশিয়ার অধিরাট হইবার জন্য, প্রশান্ত মহাসাগরে প্রভুত্বলাভের জন্য, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপপুঞ্জের স্বত্বাধিকার জন্য বিরোধ-বিসংবাদ কি অসম্ভব ?

অস্নানচিত্তে এই সকল সুবৃহৎ সম্ভাবনার সম্মুখীন হইবার জন্য সাম্রাজ্যের মধ্যে এমন ভারতবর্ষ থাকা চাই, যাহা স্বাধীন, সশস্ত্র, সবল, এবং সন্তুষ্ট। কেবল সে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলে চলিবে না ; কিন্তু উপনিবেশ-সমূহকে বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়াকে (যাহার জনসংখ্যা ক্ষুদ্র, কিন্তু যাহার জনহীন ও অরক্ষিত ভূমি বিস্তৃত) সাহায্য করিতে সমর্থ হওয়া আবশ্যক। কেবল এক ভারতবর্ষেরই এমন প্রভূত জনশক্তি আছে, যাহার সাহায্যে এশিয়ায় বৃটিশ-সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হওয়া সম্ভব। যে অদূরদর্শিতার ফলে বৃটিশ রাজচ্ছত্রের ছায়ায় স্বরাজ-প্রাপ্ত সবল স্বপ্রতিষ্ঠ ভারতবর্ষকে লইয়া কয়েকটি স্বাধীন জাতির সাহচর্য্যে এক বিশাল যুক্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রত্যবায় ঘটিতেছে, সে অদূরদর্শিতা পাপ অপেক্ষাও ভীষণ। ভারতপ্রবাসী ইংরেজ-সম্প্রদায় তারস্বরে আপনাদিগের স্বার্থের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় জনসঙ্ঘ ভবিষ্যতে অপর জাতির আক্রমণ হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে ? ভারতবর্ষ স্বাধীন ও সবল হইলে তবেই তাহারা নিরাপদ। যাঁহারা জাপানী সংবাদপত্র পাঠ করেন,

তাঁহারা জানেন যে, এই যুদ্ধের সময়েও তাহারা অসঙ্কোচে জার্ম্মাণীর সম্বন্ধে তাহাদের প্রবল পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছে। যুদ্ধের পর এই দুই দুরাকাঙ্ক্ষ দুর্দ্দমনীয় জাতির মধ্যে মৈত্রীস্থাপন আদৌ বিচিত্র নহে। জাপান তাহার সৈন্যবল ও নৌবল অক্ষুণ্ণ লইয়া এই যুদ্ধ-ব্যাপার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাণিজ্যবল অতিশয় উৎকর্ষলাভ করিবে। অতএব বুদ্ধিমান্ রাজনীতিকের ব্যবস্থামতে ইংলণ্ডের উচিত যে, জাপানের অপেক্ষা ভারতবর্ষকে অধিক বিশ্বাস করা। আমরা চাই যে, এশিয়ায় বৃটিশ-সাম্রাজ্য স্বাধীন ও সন্তুষ্ট ভারতীয় প্রজার রাজভক্তির দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক। সে সাম্রাজ্য যেন সম্ভাবিত ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষণভঙ্গুর বন্ধুতার উপর নির্ভর না করে। কারণ, আন্তর্জ্জাতিক মিত্রতা জাতিগত স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত; তাহার ভিত্তি-ভূমি বালুকা, প্রস্তর নহে।

ভারতপ্রবাসী ইংরাজের অনেকেরই ধারণা এই যে, তাহাদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য (১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই স্বার্থের পরিমাণ ৩৬৫৩৯৯০০০ পাউণ্ড ছিল) ভারতে ইংরাজের প্রভুত্ব অত্যাবশ্যক। কিন্তু যদিচ ইংরাজ জাতির আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৬৮৮০৭৮০০০ পাউণ্ড খাটিতেছে, এবং আর্য্যেণ্টাইন প্রদেশে ২৬৯৮০৮০০০ পাউণ্ড খাটিতেছে, কৈ সে সকল দেশে ত ইহারা প্রভুত্বস্থাপনের দাবী করে না? তবে ভারতবর্ষে টাকা খাটাইতেছে বলিয়া তাহারা কেন প্রভুত্বের দাবী করিবে? "ভারতবর্ষ আমাদের সম্পত্তি, আমাদের প্রয়োজনে ইহার বিনিয়োগ করিব" এই ভ্রান্ত ধারণা ইংরাজকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। "ভারতবাসী আমার বন্ধু, আমার সমকক্ষ, ভারতবর্ষ বৃটিশ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত একটী স্বাধীন রাজ্য, আমাদের মতই একটী স্বতন্ত্র জাতি, সাম্রাজ্যের অংশীদার, পরতন্ত্র নহে" এই ভাবই ইংরাজকে অতঃপর পোষণ করিতে হইবে।

জাপান, চীন এবং এসিয়াস্থ রুসিয়ায় যে গণতন্ত্রের প্রেরণা উঠিয়াছে,

ভারতের তন্ত্রীতে তাহার প্রতিধ্বনি বাজিতেছে। কেহ যদি মনে করেন যে, এ তরঙ্গ ভারতের ভাব তটে আঘাত করিবে না, তবে তিনি ভ্রান্ত।

(খ) বিদেশী শাসন ও সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা।

কিন্তু এসিয়ার জাগরণ ভিন্ন অন্যান্য কারণও ভারতবর্ষে কার্য্য করিয়াছে। ইয়ুরোপে ইংলণ্ড স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিপক্ষে এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে, অথচ কিছুদিন পূর্ব্বেও ভারত সম্বন্ধে তাহার ভাব অনিশ্চিত ছিল। এ জন্য আমি বলিতেছিলাম যে, ইংলণ্ড একটী কল্যাণকর সুযোগ হেলায় হারাইয়াছে। প্রথম প্রথম ভারতবর্ষ স্থিরবিশ্বাস করিয়াছিল যে, ইংলণ্ড জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিতেছে। পার্লামেণ্ট সভায় শান্তির প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, গত অক্টোবর মাসেও এস্কিথ্ সাহেব বলিয়াছিলেন যে, মিত্ররাজ্যসমূহ শুদ্ধ স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে। স্বাধীনতার কমে তাহারা নিবৃত্ত হইবে না। ফ্রান্স যাহাতে এলসেস্ লোরেণ পুনঃপ্রাপ্ত হয়, এই প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পরাধীনতার নিগড় একেবারে দুঃসহ। কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে, ঐ নিগড় এলসেস্ লোরেন অপেক্ষা এখানে কম দুঃসহ? জাতীয় সম্মানের কম ক্ষতিকারক? এলসেস্ লোরেণে শাসক ও শাসিত উভয়ই ধর্ম্মে-কর্ম্মে ও জাতিতে এক; এ দেশে কিন্তু তাহার বিপরীত। যেমন যেমন যুদ্ধ অগ্রসর হইতে লাগিল, ভারতবাসী ধীরে ধীরে অনিচ্ছায় বুঝিতে পারিল যে, স্বেচ্ছাচারীর প্রতি যে বিদ্বেষ, তাহা কেবল পশ্চিম ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছাচারকে লক্ষ্য করিয়া; আর পরাধীনতার যে দুঃসহ অপমান, তাহা কেবল শ্বেতাঙ্গ জাতিদিগের পক্ষে প্রযোজ্য। ইহাও বুঝিল যে, সকল দেশেই স্বাধীনতার বৃষ্টি হইবে, কেবল

ভারতের ভূমি শুষ্ক থাকিবে, এবং উপনিবেশ সকলকে নূতন অধিকার দেওয়া হইবে; কেবল ভারত রিক্তহস্তে ফিরিবে। সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাজপুরুষেরা যে সকল বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষকে যেন ইচ্ছা করিয়া বাদ দেওয়া হইল, এবং অবশেষে স্পষ্টতঃ শ্বেতসাম্রাজ্যের প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ঐ সাম্রাজ্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা থাকিবেন, শ্বেতজাতি-পঞ্চক; এবং কৃষ্ণকায় জাতিদের সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গদিগের তত্ত্বাবধানে চিরস্থায়ী নাবালকত্ব বিহিত হইল। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, এবং ভয়ের যথেষ্ট কারণ দেখা গেল। সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের জন্য আলোচনা চলিতে লাগিল; কিন্তু তথায় ভারতবর্ষের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল না। উপনিবেশদিগকে অংশিরূপে গ্রহণ করা স্থির হইল। তবে কি ভারতবর্ষ চিরদিন পরাধীনই থাকিবে? খোলা তপ্ত থাকিতে থাকিতে বনার-ল সাহেব উপনিবেশদিগকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। ভারত কি হেলায় ঐ সুযোগ হারাইবে? ফ্লাণ্ডার্সে, ফ্রান্সে, গ্যালাপোলীতে, এসিয়া-মাইনরে, চীনে, আফ্রিকায় ভারতীয় সেনা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু যাহার জন্য যুদ্ধ করিল, ভারত কি সেই স্বাধীনতার ভাগী হইতে পারিবে না? অবশেষে ভারতবাসী সুপ্তোত্থিত হইয়া ভারতমাতার এক সুপুত্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'স্বাধীনতা আমাদের বিধিদত্ত অধিকার, আমি স্বাধীন হইতে চাই।' সে স্বরাজ-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিল, এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহার যোগ্যস্থান দাবী করিল।

এইরূপে যদিও সে সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করিতে উদাসীন হইল না, এবং যদিও সে যুদ্ধসংক্রান্ত বিবিধ ব্যাপারে (হাঁসপাতাল-জাহাজ, সমর-ফণ্ড, রেডক্রস অনুষ্ঠান, এবং সুবৃৎ সমর-ঋণে) জলের মত অর্থ ঢালিতে লাগিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটী পীড়াদায়ক আতঙ্ক তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল যে, যদি না সে নিজের দেশে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিতে

পারে, তাহা হইলে হয়ত সাম্রাজ্যের বিজয়ে তাঁহার স্বাধীনতা আরও খর্ব্ব হইবে।

সাম্রাজ্য-পরিষদের অধিবেশন—যাহা সাম্রাজ্য-ঘটিত-ব্যাপারের আলোচনার জন্য সমবেত হইয়াছিল, তথায় ভারতগবর্মেণ্টকে প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার দিয়া ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজ সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল, যে স্থলে অন্যান্য দেশ নিজের নিজের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল, সে স্থলে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন—গবর্মেণ্টের নিযুক্ত, প্রজার নিকট দায়িত্বশূন্য ব্যক্তিগণ। যাঁহারা ঐরূপ প্রতিনিধি হইয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আপত্তির কিছু কারণ ছিল না। কিন্তু তাঁহারা গবর্মেণ্টের নিযুক্ত প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক-সভার নির্ব্বাচিত সভাগণের মনোনীত প্রতিনিধি নহেন, ইহাই আপত্তির বিষয় ছিল। ব্যবস্থাপক-সভায় মাননীয় খান বাহাদুর সাফী সাহেব ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লাট সাহেবকে সম্বোধন করিয়া যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—"এই আশা ও প্রত্যাশার অবস্থায় প্রস্তাবক মহাশয়ের মন্তব্য যথাযোগ্য হয় নাই। ইনি সাম্রাজ্য-সমিতিতে সরকারী প্রতিনিধি পাঠাইতে চাহেন, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাইবার প্রসঙ্গ করেন নাই। সরকারী প্রতিনিধি পাঠাইবার সার্থকতা অল্প, হয় ত তাহাতে আমাদের অনিষ্টও ঘটিতে পারে। কারণ, আমি এ কথা বলিতে বাধ্য যে, জনহিতকর ব্যাপার আমারা যে চক্ষে দেখি, তাঁহারা সকল সময় সে চক্ষে দেখেন না। অনেক সময় তাঁহাদের মতি গতি আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধ। এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, সাম্রাজ্য-পরিষদে ইংলণ্ডের এবং স্বায়ত্তশাসক উপনিবেশ-সমূহের মন্ত্রিগণ সমবেত হইবেন, কিন্তু ঐ সকল কর্ম্মচারীতে এবং আমাদের

কর্ম্মচারীতে অনেক প্রভেদ। তাঁহাদের মন্ত্রিগণ প্রকৃতিপুঞ্জের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি, সেই সেই দেশের জনসাধারণের মুখস্বরূপ, এবং তাহাদের কার্য্যাকার্য্যের জন্য প্রজার নিকট দায়ী; কিন্তু আমাদের কর্ম্মচারিগণ নামে মাত্র সাধারণের সেবক; কার্য্যে তাঁহারা আমাদিগের প্রভু। আমি আশা করি যে, আপনার হিতকারী শাসনের গুণে আমাদের এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের শূন্যে সৌধরচনা শোভা পাইবে না। কারণ, তাহা স্বপ্নদৃষ্ট অট্টালিকার মত হঠাৎ বিলীন হইতে পারে।"

ঐ সাম্রাজ্য-পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গকে স্থানদান একটা যুগান্তরকারী ঘটনা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহারা প্রতিনিধি ছিলেন বটে; কিন্তু ভারতের নয়, ভারত গবর্মেণ্টের; এইখানেই প্রভেদ। কারণ, তাহাদের সহযোগিগণ স্ব স্ব দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি। তথাপি তাঁহাদের কার্য্যে আমরা সন্তুষ্ট। কারণ, তাঁহারা যোগ্য ও বহুজ্ঞ ব্যক্তি। যদিচ দুইটি বিষয়ে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যগত বিশিষ্ট বাণিজ্যবিধান ও চুক্তিবদ্ধ কুলীর সম্বন্ধে তাঁহাদের কার্য্য আমাদের মনোমত হয় নাই, তথাপি আমরা আশা করিতে পারি যে, এই পরিষদে ভারত-সন্তানকে স্থানদানের ফলে 'ছুঁচ হইয়া প্রবেশ ও ফাল হইয়া নির্গত হইবার' প্রবাদ সার্থক হইবে। অন্ততঃ তাঁহাদের সহযোগিগণ এবার বুঝিয়াছেন যে, যদিচ ভারত পরাধীন বটে, তথাপি ভারতসন্তান তাঁহাদের সম্পূর্ণ সমকক্ষ।

এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পব্লিক সার্ভিস কমিশনের মন্তব্যে ভারতে নৈরাশ্য ও বিরক্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য, ঐ মন্তব্য অন্য যুগের কথা, বর্ত্তমানে আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কমিশনের সভ্যদিগের অধিকাংশের মতে ভারতশাসনে ইংরাজের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করা আবশ্যক, এবং ৩০ বৎসর

পরে ভারতবাসী সিভিল-সার্ভিস ও পুলিস বিভাগের চারি আনা মাত্র পদ পাইতে পারিবে। ঐ কমিশনের যখন সামান্য উল্লেখও করিলাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে বিচারপতি রহিম সাহেবকে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ধন্য-বাদ জ্ঞাপন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তিনি সুদুর্লভ সাহসের পরিচয় দিয়া একক সমস্ত সভ্যের অনুমোদিত মন্তব্যের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষে কি সুসঙ্গত প্রণালীমতে কর্ম্মচারি-নিয়োগ করা উচিত, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঐ সমিতিতে তিন জন মাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে রিপোর্ট-প্রকাশের পূর্ব্বেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া-ছিলেন। আমরা জানি, সমিতির অধিবেশনের সময় তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার অপমান ও বেদনায় তাঁহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছিল। রহিম সাহেবের কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাননীয় চৌবল মহোদয় রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি উহার অনেকগুলি গুরুতর প্রস্তাবের সহিত একমত নহেন। যাহা হউক, ঐ সমিতির রিপোর্টকে আমরা পূর্ব্ব-মন্বন্তরের ব্যাপার বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি। উহা প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের বস্তু হইতে পারে—সাধারণের উহাতে কোনও প্রয়োজন নাই।

এই সমস্ত কারণে ভারতবাসী বাধ্য হইয়া বুঝিয়াছিল যে, জগতের মধ্যে তাহার অদৃষ্টেই চিরদাসত্ব। ইংলণ্ডে ইংরেজ প্রভু, ফ্রান্সে ফরাসী, আমেরিকায় মার্কিণ জাতি, উপনিবেশসমূহে ঔপনিবেশিকগণ প্রভু; কিন্তু ভারতবাসী কোথাও প্রভু নহে। পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারতবাসীই 'নিজবাসভূমে পরবাসী'। 'বৃটিশের জন্য বৃটন'—যদি এ কথা বল, তোমার উক্তি ন্যায্য ও সঙ্গত; কিন্তু যদি বল, 'ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষ,' তবে শুধু অন্যায় বলিলে, তা' নয়, তুমি রাজদ্রোহী। তোমার বলা উচিত,

'সাম্রাজ্যের জন্য-ভারতবর্ষ'; বরং আরও ভাল,—যদি বল, 'ভারতকে বাদ দিয়া যে সাম্রাজ্য, তাহার জন্য ভারতবর্ষ'।

ইংরেজের পক্ষে স্বদেশীয় পণ্য-গ্রহণ সুবুদ্ধি ও স্বদেশ-প্রেমের ঘোষক কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে বিদেশী বর্জ্জন সংকীর্ণতা ও সাম্রাজ্য-দ্রোহের পরিচায়ক। ভারতবাসীর পক্ষে এই বিধান যে, সে চিরদিন প্রফুল্ল-চিত্তে এখনকার মত—'অধীনতার আবহাওয়ায়' (ইহা গোপালকৃষ্ণ গোখলের শব্দ) বসবাস করুক, এবং যে সাম্রাজ্যে সে সামাজিকের অধিকারবর্জ্জিত, সেই সাম্রাজ্যের জন্য গর্ব্ব অনুভব করুক। আর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অপরাপর জাতির পক্ষে এই বিধান যে, তাহারা সামাজিকের পূর্ণ অধিকারে অধিকারী হইয়া সাম্রাজ্যভুক্ত থাকুক। এইরূপে ঠিক যখন ইংলণ্ডের প্রতি ভারতবাসীর বিশ্বাস বিলুপ্ত হইতেছিল, এমন সময় মণ্টেগু সাহেবের ভারতসচিব-পদে নিয়োগরূপ আনন্দ-সংবাদ ভারতে ঘোষিত হইল, এবং ভারতবাসীর অভাব অভিযোগ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের রাজপ্রতিনিধির নিমন্ত্রণ তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে যেন আলোক-রেখা ফুটিয়া উঠিল, ইংলণ্ডের সম্বন্ধে প্রনষ্ট বিশ্বাস নব-জীবন লাভ করিল, এবং সুহৃৎসমাগমের সম্ভাবনায় ভারতময় আনন্দ-তূর্য্য বাজিয়া উঠিল।

এইরূপে ভারতবাসীর সম্বন্ধে গবর্মেণ্টে ও বৃটিশ গভর্মেণ্টের ভাবান্তর হওয়ায় ভারতের ভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, স্বরাজ-লাভের জন্য ভারতবাসীর দৃঢ় সংকল্পের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হইয়াছে। সন্ধির প্রস্তাব শুনিতে তাহার আপত্তি নাই, কিন্তু সে সন্ধি 'সম্মানসহিত সন্ধি' হওয়া চাই। এ ক্ষেত্রে সম্মানের অর্থ—স্বাধীনতা। তাহা যদি না প্রদত্ত হয়, তবে এ দেশে আরও প্রবলতর আন্দোলন আরম্ভ হইবে।

(গ) শ্বেতাঙ্গ জাতির শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসহানি।

আর্য্য-সমাজ ও থিওজফিকাল সোসাইটীর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ জাতির শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসহানির সূত্রপাত হইয়াছিল। কারণ, উভয়সমাজেরই লক্ষ্য ছিল—ভারতবাসীর হৃদয়ে ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষ-ভাবনা জাগ্রত করা, এবং তাহাকে অতীতের গৌরবে গৌরবিত করিয়া বর্ত্তমানে আত্মসম্মান এবং ভবিষ্যতে আত্মনির্ভর আনয়ন করা। ঐ দুই সমাজের চেষ্টার ফলে সর্ব্ব বিষয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণস্পৃহা ক্রমশঃ নিবারিত হইয়াছিল, এবং পাশ্চাত্য জাতির চিন্তা ও সভ্যতার মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বিশেষভাবে কার্য্য করিয়াছিল। তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম, তাঁহার দেশানুরাগ, এবং তৎকৃত পাশ্চাত্য জড়বাদের অনিষ্টকারিতা-প্রদর্শন ভারতীয় সমাজে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। তাঁহার একটী উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—"ভারতসন্তানগণ! আমি যে আজ ভারতের গৌরবময় অতীতের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। অনেকে অনেকবার আমাকে বলিয়াছেন যে, অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত কেবল যে নিষ্ফল, তাহা নহে, তদ্দ্বারা মানুষের অবনতি ঘটে। এ কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, অতীতই ভবিষ্যতের নির্ম্মাণকর্ত্তা। অতএব, দূর অতীতের প্রতি—যত দূর দৃষ্টি চলে, দৃষ্টিক্ষেপ কর। অতীতের সনাতন ধারায় অবগাহন কর। তাহার পর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া অগ্রসর হও, এবং ভারতের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর কর। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কত মহান্ ছিলেন, তাহা মনে রাখা চাই। কোন্ বংশে আমার জন্ম, কোন্ রক্ত আমার ধমনীতে প্রবাহিত, তাহার জ্ঞান থাকা চাই। আমাদের আভিজাত্যে, আমাদের গৌরবময় অতীতে, বিশ্বাস

থাকা চাই। সেই বিশ্বাস হইতে গৌরবিত অতীতের সেই স্মৃতি হইতেই অতীতের অপেক্ষাও মহিমান্বিত ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতে পারিব।” আর একটি উক্তি শুনুন :—“আমি নিশ্চয় জানি, প্রত্যেক সভ্যদেশের লক্ষ লক্ষ—হাঁ, প্রকৃতই লক্ষ লক্ষ নর-নারী ভারতের বাণী শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—যে বাণী তাহাদিগকে মুদ্রার উপাসক জড়বাদ-দানবের বিকট গ্রাস হইতে পরিত্রাণ করিবে। এখন নব্যতন্ত্রের সমাজ-সংস্কারকদিগের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, বেদান্তের উচ্চভাব ভিন্ন তাঁহাদের সামাজিক চেষ্টার মধ্যে কেহই আধ্যাত্মিক সঞ্চার করিতে পারিবে না।”

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও দার্শনিক কৃত সংস্কৃত সাহিত্যের স্তুতিবাদও এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছিল। তথাপি এই ভাবান্তর অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল—সাধারণের অধিগত ছিল না। কিন্তু যখন ভারতবাসী দেখিল, জাপান-যুদ্ধে রুস পরাজিত হইল, একটি ক্ষুদ্র প্রাচ্য জাতি এক সুবৃহৎ পাশ্চাত্য জাতিকে পরাভূত করিল, যখন দেখিল, রুসীয় জন-নায়কগণ দুর্ব্বল ও অন্তঃসারহীন, আর তাহাদের সবল ও সুদৃঢ় প্রতিদ্বন্দ্বিগণ দেশের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত—তখনই শ্বেতাঙ্গ জাতির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে তাহাদের পূর্ব্বতন বিশ্বাস আঘাত প্রাপ্ত হইল। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মাণীর দুর্ব্যবহারে ঐ বিশ্বাস আরও দুর্ব্বল হইয়াছে। একে ত রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধে জর্ম্মণ মত-বাদ স্পষ্টতঃ দ্বিধাহীন। তাহার উপর ভারতবাসী যখন দেখিল যে, অভিযানের সময় জর্ম্মনেরা বিজিত দেশের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করে, এবং প্রতিযানের সময় পরিত্যক্ত প্রদেশকে কিরূপে বিধ্বস্ত করে, আর বিসমার্কের শিক্ষা ফ্রান্স, ফ্লান্‌ডার্স, বেলজিয়ম, পোলণ্ড, সার্ভিয়া প্রভৃতিতে কতটা কার্য্য-করী হইয়াছে, তখন ‘এসিয়ার তুলনায় খৃষ্টিয়ান ইয়োরোপ অনেক শ্রেষ্ঠ’

এই ভ্রান্ত ধারণা একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। দেখা গেল যে, ইয়োরোপ যে সভ্যতার এত বড়াই করে, তাহা বাহ্য চাকচিক্যমাত্র, তাহার ধর্ম্মও কেবল প্রাণ-হীন বাহ্য অনুষ্ঠানমাত্র। অতএব ইয়োরোপের রণক্ষেত্রে হত ও আহতদিগের বিকট স্তূপ লক্ষ্য করিয়া, এবং নিত্য নূতন ছেদন ও ভেদনকারী যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্রের উদ্ভাবনে নিযুক্ত বিজ্ঞানকে দানবিকত্বায় পরিণত দেখিয়া এশিয়া যদি নিজেদের ধর্ম্ম ও সভ্যতার পক্ষপাতী হয়, তবে কি তাহাকে অপরাধী বলিতে হইবে?

কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহের বহিঃ-কোলাহল অপেক্ষা আর এক সন্দেহ নিবিড়তর ভাবে ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। পাশ্চাত্য-দিগের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহারা তারস্বরে স্বাধীনতা ও জাতীয়তা সম্বন্ধে যে সকল উচ্চ আদর্শের ঘোষণা করেন, তাহার সত্যতার সম্বন্ধে ঘোষকদিগের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ ভারতবাসীর হৃদয়কে আঘাত করিয়াছে। যুক্ত-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সার জন মেষ্টন সে দিন যে বলিয়াছিলেন যে, আজ তিনি ভারতবাসার মধ্যে যেরূপ সংদিগ্ধ ও প্রত্যয়-হীন ভাব দেখিতেছেন, তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ঐরূপ ভাব কখনও দেখেন নাই, তাহা অপ্রকৃত নহে। অনেক বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী-গণ উপর্য্যুপরি রাজপুরুষ-কৃত প্রতিজ্ঞা ও শপথভঙ্গের মনস্তাপে জর্জ্জরিত হইতেছিল। তাহার উপর এ দেশে রাজনৈতিক নির্য্যাতন অবাধে চলিয়াছে; আর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে সকল কঠোর আইন প্রচলিত ছিল, এই কয়েক বৎসরে তাহাদের সংখ্যা ও পরিমাণ বেশ বাড়িয়াছে, এবং যদিও সন্ধির পবিত্রতা ও জাতীয়তা রক্ষার জন্য ইয়োরোপে যুদ্ধ চলিতেছে, তথাপি এ দেশে ঐ নির্য্যাতন-নীতির সঙ্কোচ না হইয়া প্রসার বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সকল কারণে ভারতবাসীর সন্দেহ ঘনীভূত হইয়াছে। যদি এক সন্দেহ দূর করিতে হয়, তবে সরলভাবে সাহসের সহিত রাজ-

নীতিজ্ঞদিগকে দীর্ঘ প্রত্যাশিত সংস্কার-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। রাজনীতিক ছিটাফোঁটার আর কাল নাই ; এখন বিজ্ঞতার সহিত বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন করিবার সময় আসিয়াছে।

যে সকল ব্যাপারের সহিত প্রজার সুখ-স্বচ্ছন্দতার নিকট সম্বন্ধ, সেই সকল ব্যাপার সম্বন্ধে ইংরেজ-শাসিত ভারত কিরূপ মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে, এবং তাহার তুলনায় কোনও কোনও ভারতীয় মিত্ররাজ্য কিরূপ দ্রুততর গতিতে উন্নতি করিয়াছে, ইহারই তুলনার সমীক্ষা ভারতবাসীর বিশ্বাসহানির অন্যতম কারণ। ভারতবাসী লক্ষ্য করিয়াছে যে তাহার স্বদেশীয় রাজা ও সচিবের নেতৃত্বে ঐ উন্নতি সাধিত হইতেছে। সে দেখিতেছে যে, মহীশূরের প্রতিনিধি-সভায় গৃহীত মন্তব্য সকল বিশিষ্ট-ভাবে বিবেচিত হইতেছে, এবং যথাসম্ভব অনুসৃত হইতেছে, এবং বুঝিতেছে যে, আমাদের ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যগণ অপেক্ষা ঐ সভার সভ্যগণ—আইনতঃ না হউক—কার্য্যতঃ বেশী অধিকার পাইয়াছেন। সে দেখিতেছে, ঐ সকল প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, নূতন শিল্পের পোষণ হইতেছে, পল্লী-সমাজ স্বায়ত্ত-শাসনে এবং নীজের দায়িত্ব-বহনে উৎসাহ পাইতেছে, সুতরাং সে বিস্মিত হইতেছে যে, এ কি অপরূপ যে, ভারতবাসীর পঙ্গুতা ইংরাজের দক্ষতা অপেক্ষা কার্য্যকরী হইয়াছে।

হয় ত মোটের উপর ভারতবাসীর পক্ষে ভারতীয় শাসনই সর্ব্বোত্তম।

(ঘ) ভারতীয় বণিকদিগের জাগরণ।

যে শক্তিপুঞ্জের সমবায়ে নূতন ভারতবর্ষ রচনা করিয়াছে, তাহার মধ্যে বোধ হয় ভারতীয় বণিকদিগের রাজনৈতিক জাগরণ সকলের অপেক্ষা সবল ও শুভদ। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের বোম্বাই শিল্প-সম্মিলনে সার দোরাব

টাটা শিল্প ও রাজনীতির রাখীবন্ধন অভীষ্ট বলিয়াছিলেন। ঐ বন্ধন এখন আগতপ্রায়। এতদিন পর্য্যন্ত বণিকেরা স্ব-স্ব ব্যাপার লইয়া নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু এখন যুদ্ধের ফলে তাঁহারা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, এবং বুঝিয়াছেন যে, রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রবেশ করা দরকার—নতুবা গবর্মেণ্টের কার্য্যপ্রণালী দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে সকল ব্যবসায় জর্ম্মণ-বাণিজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ ছিল, এবং যুদ্ধারম্ভের পর যাহাদের সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা হইল, গবর্মেণ্ট ঐ সকল ব্যবসায়কে কোনও রূপ সাহায্য করিলেন না। যে সকল নিত্য-ব্যবহার্য্য পণ্য দ্রব্য জর্ম্মণী হইতে আমদানী হইত, যুদ্ধারম্ভের পর সেই সকল পণ্যদ্রব্য এই দেশের কারখানায় তৈয়ার করিবার জন্য কারখানা-স্থাপনের উদ্যোগ হইলে গবর্মেণ্ট টাকা দিয়া বা অন্যরূপে তাহার কোনও রূপ সহায়তা করিলেন না। যুদ্ধের ফলে যে সকল শিল্পের স্বভাবতঃ বিস্তার হইবার সম্ভাবনা হইল, গবর্মেণ্ট যুদ্ধের অছিলায় এরূপ কঠোর নিয়ম করিলেন যে, তজ্জন্য সেই সকল শিল্পের প্রসার না হইয়া সঙ্কোচ সাধিত হইল। যখন যুদ্ধের জন্য টাকার বাজার খুব মন্দা হইল, তখন গবর্মেণ্ট সেই অর্থকৃচ্ছ্র-নিবারণের কোনও উপায় করিলেন না। তাহার ফল এই হইল যে, ও দিকে ইংরেজ দেনদারেরা বিলাত হইতে টাকা পাঠান বন্ধ করিল, সেই জন্য সমৃদ্ধ বণিকেরাও মুদ্রার ঘাটতি অনুভব করিতে লাগিলেন। এ দিকে কেহ কেহ নিজের ইজ্জৎ বজায় রাখিবার জন্য বাধ্য হইয়া প্রচুর লোকসান সহিয়া কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিলেন। কোনও কোনও স্থলে তাঁহারা দ্রব্যের মূল্য বাবত টাকার পরিবর্ত্তে যুদ্ধ-বণ্ড (war bond) লইতে বাধ্য হইলেন। অবশ্য, এই সকল দুর্গতি বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। বোম্বাইয়ের ধনশালী ও স্বাধীন বণিক-

দিগকে তত কষ্ট সহিতে হয় নাই, যত মান্দ্রাজের বণিকেরা (যাঁহাদের অভাব-অভিযোগের সহিত আমি বেশী পরিচিত আছি) সহিয়াছেন। মান্দ্রাজে প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক ইংরেজ বণিকদের প্রতি পক্ষপাত করাতে, এবং ঐ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদিগের মধ্যে দেশীয় লোক আদৌ না থাকাতে, মান্দ্রাজ প্রদেশের বণিকদিগকে অধিকতর কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর কাগজের দরের ঘাটতি হওয়ায় বণিকদিগের দুশ্চিন্তার কারণ আরও বাড়িয়াছিল। কারণ, যখন জরুরী প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া তাহারা কোম্পানীর কাগজ বাজারে বিক্রয় করিয়াছিল, তখন যে কেবল মূলধনের অপচয় হইয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু কোম্পানীর কাগজের দর ঘাট্‌তি হওয়ায় সকলের মনে গবর্মেণ্টের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও আতঙ্কের উদয় হইয়াছিল।

গোলযোগের আর একটী কারণ হইয়াছিল এই যে, কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের জমী ও খনি প্রভৃতি নিম্ন সত্ব বিদেশীয়েরা হস্তগত করিতেছিল, কিন্তু গবর্মেণ্ট সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন।

পশ্চিম উপকূলের নারিকেলের মালার ও নারিকেল-ছোবড়ার ব্যবসায় ভারতবাসীর হস্তচ্যুত হইয়া জর্ম্মনীর হস্তগত হইয়াছিল। যুদ্ধের ফলে এই ব্যবসায় যখন জর্ম্মনীর কবলমুক্ত হইল, তখন ইহা ইংরাজ বণিকের গ্রাসে পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। সুখের বিষয়, টাটা এণ্ড সন্স কোম্পানী মাহেন্দ্রক্ষণে অগ্রসর হইয়া ব্যবসায়টীকে বিদেশীর গ্রাস হইতে রক্ষা করিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে মোনাজাইট (monazite) নামক খনিজ দ্রব্যের কারবার (গোলাগুলি প্রস্তুত করিবার ইহা একটা উপাদান) জর্ম্মনেরা একচেটিয়া করিয়াছিল। ভারতীয় অভ্রের খনির অধিকাংশ জর্ম্মনীর হস্তগত হইয়াছিল। অমার্জ্জিত চামড়া বহুলপরিমাণে জর্ম্মনীতে রপ্তানী হইত। অথচ দেখা গিয়াছিল যে, মহীসুরে ভারতীয়

কারখানায় ইয়ুরোপ অপেক্ষা এই মার্জ্জন ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত, এবং অল্পমাত্র সাহায্য পাইলে এই চামড়ার ব্যবসায় খুব একটা লাভ-জনক ব্যাপারে পরিণত হইতে পারিত। তাহা না করিয়া গবর্মেণ্ট নিজের নির্দ্দিষ্ট দরে প্রচুরপরিমাণ অমার্জ্জিত চামড়া খরিদ করিতে লাগিলেন, এবং সেই চামড়া মার্জ্জন করিয়া শিল্প-দ্রব্যে পরিণত করিবার জন্য বিদেশে পাঠাইতে লাগিলেন। বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বড় লাট সাহেব ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "ভারতীয় চামড়া-পরিষ্কর্ত্তাদিগকে প্রচুর অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, চামড়া মার্জ্জন সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে, এবং ঐ ব্যবসায়ে সফলতার সম্ভাবনা দৃঢ় হইয়াছে। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের পর চামড়া-মার্জ্জনের ব্যবসায় প্রচুর প্রসার লাভ করিবে। কিন্তু ইতি-মধ্যে যুদ্ধের নির্দ্দিষ্ট হারে চামড়া খরিদ হইবে, এই হুকুম প্রচারিত হওয়ায়, চামড়া-ব্যবসায়ীরা সন্ত্রস্ত হইয়াছেন। কারণ, কেবল যুদ্ধস্থলে ব্যবহারের জন্য নয়, ইংলণ্ডের জনসাধারণকে সস্তা দরে চামড়ার দ্রব্য যোগাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে ইংলণ্ডের সমর-আফিস এই দেশে চামড়া খরিদ করিতেছেন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি জনসাধারণকে বুট যোগানের সহিত সমর-আফিসের কি সম্বন্ধ? সুধু যুদ্ধের প্রয়োজনে নয়, যুদ্ধেতর প্রয়োজনেও কি ভারতকে শোষণ করিতে হইবে? যখন ইংলণ্ডের মহাজনদিগের অর্থে নয়, ভারতের ব্যয়ে বিশেষজ্ঞেরা চামড়া-সংস্কার সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছেন, তখন তাহাদের পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞান ভারতেরই সম্পত্তি হওয়া উচিত, এবং ভারতীয় প্রজার সমৃদ্ধিসাধনেই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ কারখানার মালিকদিগের উহা দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

যুদ্ধের ফলে ভারতের বিপুল স্বভাবজাত সম্পদের সদ্ব্যবহার করিবার পক্ষে গবর্মেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং সেদিন বড়লাট সাহেব বলিয়াছেন যে, ভারতকে স্বাবলম্ব করিবার জন্য, এবং বিদেশীয় পণ্য দ্রব্যের উপর ভারতের নির্ভর হ্রস্ব করিবার জন্য ঐ সকল সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই অভিপ্রায়ের সমর্থন করি। ভারতবাসীরা অনেক দিন হইতে এই কথাই বলিতেছিল, কারণ, ভারতবর্ষের আবহাওয়া ও মাটির এতই বৈচিত্র্য যে, আমাদের যে কিছু প্রয়োজন, সমস্তই এ দেশে উৎপন্ন করা যাইতে পারে, এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ফিলোমোর সাহেব যে বলিয়াছিলেন, এখনও আমাদের ভূমির উচ্ছিষ্ট দ্বারা সমস্ত পৃথিবী পরিতুষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু প্রথমতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, তাহার পর বৃটিশ গবর্মেণ্ট, এবং সম্প্রতি শোষণশীল সাম্রাজ্যপন্থী বণিক-সম্প্রদায় দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষ কেবল কারু-কার্য্যের উপযোগী উপাদানমাত্র যোগাইবে। সেই উপাদান বিদেশে রপ্তানী হইবে, এবং বিদেশী কারখানায়—ঐ কারখানা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশে স্থিত হইলেই ভাল হয়—পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়া ভারতে আমদানী হইবে, এবং ভারতবাসী তাহাই খরিদ করিবে। অনেক দিন পূর্ব্বে মেকলে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি-হানির সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতী বাণিজ্যের অদ্ভুত প্রসার দৃষ্ট হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি যদি ভারতীয় কলকারখানার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে পারেন ('ভারতীয়' অর্থে ভারতবর্ষে স্থিত ইংরাজী কলকারখানা নয়) তবে তিনি চিরদিনের জন্য ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। ইনডাষ্ট্রিয়াল কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়া এক জন বলিয়াছেন যে, ভারতের উচিত,—ভারতবর্ষের বাহিরে ব্যবহারের জন্য চাষের দ্রব্য উৎপন্ন করা; অর্থাৎ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যাহা

বলিতেন, ভারতবর্ষ অপরের কারখানার উপাদান যোগাইবার জন্য একটা আবাদে পরিণত হউক। কথাটা যদি অপ্রিয় হয়, তবে বড়লাট বাহাদুর ক্ষমা করিবেন, কিন্তু পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এ কথা ভুলিব না যে, এক শতাব্দী পূর্ব্বে মধ্য-ভারতে লৌহের খনি পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই লৌহ উত্তোলন করিবার কোনও ব্যবস্থাই করা হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, তখন ইংলণ্ডই জগৎকে লৌহ যোগাইয়া প্রভূত লাভবান্ হইতেছিল। সে স্বভাবতঃই ঐ ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী আসিতে দেয় নাই। এতদিন পরে টাটা কোম্পানী লৌহ খনির উদ্ধার করিয়াছে—আজ তাহাদের শেয়ার ৩০৲ টাকার স্থলে ১১৮০৲ টাকায় বিকাইতেছে। টাটারা একটা প্রকাণ্ড কারখানা খুলিয়াছেন, এবং টাটার ইস্পাতের এত কাটতি যে, তাঁহারা যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই ব্যাপার যদি ১০০ বৎসর পূর্ব্বে আরব্ধ হইত, যদি এত বৎসর ধরিয়া লৌহের কারখানা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তবে কি আজ কলকারখানার জন্য আমাদিগকে ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষা করিতে হইত? উহার অভাবেইত, আমরা নূতন কারখানা খুলিতে পারিতেছি না, পুরাতন কারখানা বাড়াইতে পারিতেছি না, এবং ইংলণ্ডের অনেক কারখানা যুদ্ধের প্রয়োজনে নিযুক্ত থাকায় বাজারে যে সকল পণ্যের অভাব হইয়াছে তাহাও যোগাইতে পারিতেছি না।

বড়লাট সাহেব সেদিন যথার্থই বলিয়াছেন—'এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে কিছু চেষ্টা হইয়াছে, তাহা ক্বচিৎ-কদাচিৎ হইয়াছে, স্থায়ী চেষ্টা হয় নাই।' তিনি আরও বলিয়াছেন—"বৈজ্ঞানিক কৃষিকর্ম্ম সম্বন্ধে পরীক্ষা ও প্রদর্শন কার্য্যের ব্যবস্থাপন, এবং ভূতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক খনিজ শিল্পের সাহায্যদান দ্বারা যে আশাপ্রদ ফললাভ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, অন্যান্য শিল্প—বিশেষতঃ কারু-শিল্পের হিতার্থে ঐরূপ প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিবার সময়

আসিয়াছে।” এ প্রসঙ্গে কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বৈজ্ঞানিক কৃষি-সম্বন্ধীয় পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানও অনেক স্থলে ভারতের প্রয়োজনে নয়, ইংলণ্ডের প্রয়োজনে প্রযুক্ত হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের চরকায় এবং অন্যত্রও ক্ষুদ্র-তন্তু (short stapled) তুলার ব্যবহার। ল্যাঙ্কাশায়ার চাহে দীর্ঘতন্তু তুলা—মিশর ও মার্কিনদেশে তাহা যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে না। অতএব ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-তন্তু তুলার পরিবর্ত্তে দীর্ঘতন্তুর চাষ করা হউক। এ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আমাদের বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল না। যে ইংলণ্ডকে আমাদের আদর্শ বলা হয়, কই, সেই ইংলণ্ডের শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাসে ত কখনও দেখি নাই যে, ইংলণ্ড আত্মত্যাগ-ব্রতে ব্রতী হইয়া নিজের ক্ষতি করিয়া বিদেশের প্রয়োজন যোগাইবার জন্য আপনার উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকার নির্দ্ধারণ করিয়াছে।

যাহা হউক, যুদ্ধের একটা সুফল এই হইয়াছে যে, ভারতীয় জন-নায়কদিগের চেষ্টায় এত দিনে যাহা হয় নাই, আজ ভারতের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে শিল্প-কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, এবং গোলা বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনে শিল্প সম্বন্ধে সংহত চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। ভারতীয় বণিক্‌দিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন শিল্প সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট-কৃত এই সংহতি ও সাহায্যের ফলে তাঁহাদের বর্ত্তমান শোচনীয় তাঁবেদারীর অবস্থা আরও শোচনীয় না হয়। তাহা যাহাতে না হয়, গবর্মেণ্ট যাহাতে আমাদের নিজস্ব হয়, তজ্জন্য শাসন-শক্তিতে তাঁহাদিগকে শক্তিমান্ হইতে হইবে। ভারতীয় বণিক্‌দিগের মধ্যে আজ যে জাগরণ দৃষ্ট হইতেছে, ঐরূপ সম্ভাবনার আতঙ্ক তাহার প্রধান কারণ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখুন—কৃষিজাত পণ্য-লব্ধ আয়ের উপর কর ধার্য্য করা হইয়াছিল। চা যদিও কৃষিজাত পণ্য, কিন্তু চা-করেরা প্রধানতঃ ইংরেজ

বলিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত চায়ের বিক্রয়-লব্ধ অর্থের উপর কর ধার্য্য হয় নাই। যদি এই নীতিই অনুসৃত হয়, এবং ভারতীয় অর্থে পুষ্ট পণ্য-শিল্পের পোষণ দ্বারা ঐ ঐ শিল্প বিদেশীয়দিগের হস্তগত হয়, তবে ভারতবাসীর ভাগ্যে ইংরেজ হাউসওয়ালার অধীনে কেরাণীগিরি ডুবাস্-গিরি ইত্যাদি ভিন্ন স্বাধীন সওদাগরী কখনও জুটিবে না, এবং দিনদিন প্রতিযোগিতার ফলে ক্ষীয়মাণ বেতনই তাহার জীবিকার সম্বল হইবে।

যদি ভারতবাসীরা এখনও আত্মরক্ষায় উদ্‌যোগী হইতে পারে, তবে শিল্প সম্পর্কে ভারতের ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যময় নহে। এ সম্বন্ধে টোজার সাহেব তাঁহার "বৃটিশ ইণ্ডিয়ার বাণিজ্য" (British India and its trade) নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"তুলা ও পাটজাত পণ্য দ্রব্যের পরিমাণ এখনই অল্প নহে; উহার প্রসারবৃদ্ধির এখনও ক্ষেত্র রহিয়াছে। এ দেশে চিনি ও তামাক যথেষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু উহাদিগের চাষে ও তৈয়ারীতে চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হওয়া উচিত। তৈল-শস্যের রপ্তানী না করিয়া উহা এ দেশেই ভাঙ্গান উচিত, আর কার্পাসের বীজ—যাহার এখন যথাযথ ব্যবহার হইতেছে না, তাহার সদ্ব্যবহার হওয়া উচিত। চামড়া ও খোলস, যাহা এখন প্রচুরপরিমাণে রপ্তানী করা হয়, তাহার সংস্কার ও মার্জ্জন অনেকপরিমাণে এ দেশেই হইতে পারে। রেশমী ও পশমী দ্রব্য, যাহা এখন এ দেশে প্রস্তুত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই মোটা জিনিস; সূক্ষ্ম ও মসৃণ মাল প্রস্তুত করার সুযোগ আছে। রেল-কোম্পানীরা নিজের গাড়ী এ দেশেই প্রস্তুত করে বটে, কিন্তু চাকা, নেমিঁ, অরঁ প্রভৃতি লৌহ-দ্রব্য বিদেশ হইতে আনীত হয়। সম্প্রতি এ দেশে ইস্পাত অল্পই প্রস্তুত হয়, এবং যদিও লোহা ঢালাইয়ের কারখানা এবং কল প্রস্তুত করিবার কারখানার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে,

কিন্তু ইহার ভূয়িষ্ঠ বিস্তার সম্ভব। কল ও যন্ত্র প্রায়ই আমদানী করিতে হইতেছে। লক্ষ লক্ষ কৃষক ও কারিকর মোটা রকমের যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে। উহার পরিবর্ত্তে ভাল কারিকরের তৈয়ারী মজবুদ যন্ত্রের ব্যবহার করিলে ভাল হয়। উৎকৃষ্টতর তৈল মাড়িবার কল ও চরকার যথেষ্ট কাটতি হইতে পারে। কাগজের কল ও ময়দার কলের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িতে পারে। তা ছাড়া শেলাইয়ের কল, বাজি, দড়ি, জুতা, জিন, রাশ, ঘড়ি. টেঁক ঘড়ি, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম রং, তাড়িত-উপকরণ, কাচ, কাচের দ্রব্য, চায়ের সিন্ধুক, দস্তানা, চাউল, ঝাড়, দিয়াশলাই, ল্যাম্প, বাতি, সাবান, লিলেন, ছুরি-কাঁচি, লৌহজাত পণ্যদ্রব্য বা হার্ডওয়্যার (hard-ware) ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র এ দেশে পড়িয়া রহিয়াছে।” ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ভারত-দ্রব্য দ্বারাই ভারতবর্ষের অভাব পর্য্যাপ্তরূপে মিটিতে পারে, এবং সে পূর্ব্বকালের মত উদ্বৃত্ত জিনিসও বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে। পক্ষান্তরে, ভারতের আমদানী দিন দিন বাড়িতেছে, এবং যে প্রকারে রপ্তানী চলিতেছে তাহাতে ভারতবর্ষের উচিতমত সমৃদ্ধি হইতেছে না।

যুদ্ধের পূর্ব্বে আমদানীর হার ক্রমশই বাড়িতেছিল; যুদ্ধের স্থরু হইতে উহা ক্রমশঃ কমিতেছে,—নিম্নের তালিকা হইতে উহা স্পষ্ট হইবে।

খৃষ্টাব্দ	মোট আমদানী	সূতী ও পশমী মাল
১৯১১-১২	৯২৩৮৩২০০ পাউণ্ড	২৮৫৯২০০০ পাউণ্ড
১২-১৩	১০৭৩৩২৪৯০ „	৩৫৫৩৬০০০ „
১৩-১৪	১২২১৬৫২০৩ „	৩৮৭৫৮০০০ „
১৪-১৫	৯১৯৫২৬০০ „	২৮৬৪৩০০০ „
১৫-১৬	৮৭৫৬০১৬৯ „	২৫১৭৫০০০ „

ইহার পূর্ব্বের পাঁচ বৎসরের অঙ্ক হইতেও আমদানীর বৃদ্ধির হার দেখা যাইবে।—

খৃষ্টাব্দ	টাকা
১৯০৬-৭	১৩৫৫০৮৫৬৭৬৲
৭-৮	১৬২৭১৫৫২৩৪৲
৮-৯	১৪৩৮৯৭৫৭৯৬৲
৯-১০	১৫৪৪৮৩৬২১৪৲
১০-১১	১৬৯০৫৭২৭২৯৲

কিন্তু আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর হার বেশী দেখা যায়। সেই জন্য যুদ্ধের ফলে পাওনা টাকা আদায়ের গোল বাধিয়াছে।

খৃষ্টাব্দ	পাউণ্ড
১৯১১-২২	১৪৭৮৭৯০৬০
১২-১৩	১৬০৮৯৯২৮৯
১৩-১৪	১৬২৮০৭৯০০
১৪-১৫	১১৮৩২৩৫০০
১৫-১৬	১২৮৩৫৬৬১৯

ভারতীয় বণিকগণ জাপানী ব্যবসায়ের অতি দ্রুত প্রসার লক্ষ্য করিয়াছে। তাহারা জানে, জাপানী গভর্মেণ্ট আমদানী-শুল্ক ও অর্থসাহায্য দ্বারা ঐ ব্যবসার পুষ্টিসাধন করে। নিজের দেশে তাহাদিগকে জাপানী প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুঝিতে হয়। এ অবস্থায় যদি তাহারা স্বরাজ চায়, তবে কি তাহা বিস্ময়ের বিষয়? তাহারা দেখিতেছে, জাপানী পণ্যে তাহাদের বাজার পরিপূর্ণ, এবং জাপানীরা ঐ মাল কমতি দরে বিক্রয় করিতেছে। এ অবস্থায় হোমরুল না চাহিয়া তাহাদের উপায় কি? হোমরুল হইলে তাহারা সংরক্ষণ-নীতি (protection) অবলম্বন করিয়া বিদেশী পণ্যের

উপর শুল্ক বসাইতে পারিবে। ইউরোপীয় বণিক-সভা—যাহারা ভারত-বাসীর সম্পর্কিত রাজনীতিক বিষয়ে সর্ব্বদা উদাসীন—সেই সকল সভার আকস্মিক অভ্যুত্থান দেখিয়া ভারতীয় বণিক্‌গণ বেশ বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বিগণ পাছে ভারতবাসীর হস্তে শাসনশক্তি ন্যস্ত হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়াছেন। কারণ ঐরূপ হইলে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর নগণ্য বণিকগণ যে দিন ভারতবর্ষের প্রভু হইয়াছিল, তদবধি তাহারা যে অন্যায় সুবিধা ও সুযোগ ভোগ করিয়া আসিতেছে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার খর্ব্বতা হইতে পারে। সমানে সমানে যুদ্ধে তাহারা অভ্যস্ত নয়, কাজেই ঐরূপ সম্ভাবনায় তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়াছে। তাহারা বিশিষ্ট সুবিধা চায়—ন্যায় ও সাম্যের তাহারা বিরোধী, কিন্তু সমানে সমানে প্রতিযোগিতা অপেক্ষাও তাহাদের বেশী ভয় হোমরুল বজেটকে। সেই জন্য তাহাদের এত রোষ, এত আতঙ্ক। সেই জন্যই ভারতপ্রবাসী ইংরেজের স্বার্থরক্ষার জন্য সার হিউ ব্রে ভারতে ইংরেজ-প্রভুত্বের চিরস্থায়িত্ব চাহিয়াছেন।

ভারতীয় বণিকগণ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের পর যে বাণিজ্য-যুদ্ধ বাধিবে, সেই যুদ্ধে তাহাদের পরাভব অনিবার্য্য, যদি না ইতি-মধ্যে তাহারা নিজের দেশ শাসন করিবার শক্তি নিজের হাতে লইতে পারে। ইউরোপীয় চেম্বার অফ্ কমার্স ও ট্রেড এসোসিয়েসনসমূহের সভ্যগণ যদি ভারতের ব্যবসায় ও শিল্প বাণিজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা হয়েন, তবে ভারতীয় বণিক্ ও ব্যবসাদারগণ অধঃপাতে যাইবে। এত দিন যদিও ইংরেজ বণিক্‌গণ সংযতভাবে কার্য্য করিত না; তথাপি গভর্মেণ্টের ইংরাজী ব্যাঙ্কের প্রতি পক্ষপাতের ফলে ভারতীয় বণিক্‌দিগকে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রাম করিতে হইত। ইহার উপর যদি তাহাদিগকে বিদেশী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত সংঘ-শক্তির সহিত যুঝিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ

সুনিশ্চিত। এ সম্বন্ধে জে, ডব্লিউ, রুট্ সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন:—"বর্ত্তমান অবস্থায় সমান হারে শুল্ক বসাইয়া যদি ইংলণ্ডকে ভারতের অন্তঃশিল্প ও বহির্বাণিজ্যের নিয়ন্তা করা হয়, তবে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করা হইবে। * * এ কথা মনেও ভাবিবেন না যে, যদি ভারতের শুল্ক-গত বিধিব্যবস্থার ভার ইংরেজ আইন-কর্ত্তাদের করায়ত্ত করা হয়, তবে ইংরেজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐ বিধি ব্যবস্থা প্রণীত হইবে। ভারতের শুল্ক-গত ও বাণিজ্য-গত বিধি-প্রণয়ণে অদ্যাবধি ভারতের প্রতি তীব্র ঈর্ষ্যাই মূলাধার।"

রুট সাহেব যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন, ভারতীয় বণিক্গণ তাহা বেশ লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ঐ বিপদ্-নিবারণের জন্যই তাঁহারা হোমরুলের পক্ষপাতী হইয়াছেন।

ভারতীয় বণিকগণ ইহাও বুঝিয়াছেন যে, শাসন-গত স্বরাজ ভিন্ন শুল্ক-গত স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না। শুল্ক-গত স্বাতন্ত্র্যকে বরণ করা এবং শাসন-গত স্বরাজকে প্রত্যাখ্যান করা মূঢ়তার কার্য্য। ভারতীয় রাজস্ব-সচিবের হস্তে যখন বজেট-প্রণয়নের ক্ষমতা আসিবে, তখন তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জলসেচন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্যয়ের অঙ্ক অনেক বাড়াইবেন; কারণ, ঐরূপ ব্যয়ে প্রজার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, শক্তির বিকাশ হইবে, এবং ভূমির উর্ব্বরতার বৃদ্ধি হইবে। তখন রাজস্ব হইতে রেল-নির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহিত না হইয়া ঋণলব্ধ অর্থের দ্বারা ঐ প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবে। বেতনের হার কমাইয়া ও অন্যত্র ব্যয়-সংকোচ করিয়া শাসনের ব্যয় লঘু করা হইবে। (ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দশ বৎসরে আমাদের শাসন-ব্যয় ষোঁল কোটী বাড়িয়াছে।) আয়ের অঙ্কে ভূমির উপর কর কমান হইবে, যেন কৃষক স্বীয় শ্রম দ্বারা স্বচ্ছন্দ দিনপাত করিতে পারে। যে সকল পণ্য ভারতের একচেটিয়া (যেমন পাট ও নীল) তাহার

রপ্তানীর উপর উচ্চহারে কর বসান হইবে। ভারতের প্রয়োজন অনুসারে বিদেশী আমদানীর উপরও শুল্ক বসিবে; এবং বিদেশের রাজকীয় সাহায্য-পুষ্ট পণ্যের উপর ঐরূপ শুল্কের হার খুব উচ্চ হইবে। বিদেশী মদ্যের উপর শুল্কের হার এত উচ্চ হইবে যে, যেন উহার আমদানী বন্ধ হইতে পারে। (১৯১০।১১ খৃষ্টাব্দে আমদানী-কৃত মদের দাম ছিল ১৮৯৮১৬৬৬।) ঐ বৎসর ভারতে তিন কোটী টাকার খাদ্যসামগ্রীর আমদানী হইয়াছিল। বিলাসের সামগ্রী বলিয়া উহার উপরও উচ্চ হারে শুল্ক বসান হইবে। পাঁচ বৎসরে চিনির আমদানী দশ কোটীর স্থলে ১৪ চৌদ্দ কোটী হইয়াছে। ভারতবর্ষে যাহাতে বেশী চিনি উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য আমদানী-কৃত চিনির উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসাইতে হইবে। সূতী বস্ত্রের আমদানী ৩৭ কোটীর স্থলে ৪১ কোটী হইয়াছে, এবং রেশমী বস্ত্রের আমদানী ১⅔ স্থলে ২⅔ হইয়াছে; অথচ উভয় জিনিসই ভারতে উৎপন্ন হওয়া উচিত। সম্প্রতি সমর-ব্যয় কমান চলিবে না বটে, কিন্তু ক্রমশঃ প্রাদেশিক সেনা গঠিত হইবে, এবং এ দেশেই বৃহৎ রিজার্ভ, স্থাপিত হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যেরূপ হইয়াছিল, এখানেও কিছু দিনের জন্য গোরা সৈন্য রাখা হইবে, কিন্তু 'স্বল্পকালি' প্রণালী রহিত হইবে, এবং বিলাতে রংরুট-সংগ্রহের ব্যয়-হার হ্রাস করা হইবে।

ভারতের অর্থগত অবস্থার যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে,—কেন ভারতীয় বণিক্‌গণ জাগরিত হইয়াছেন, এবং কেন তাঁহারা হোমরুলের দলে প্রবেশ করিতেছেন।

(৬) ভারতীয় নারীগণের জাগরণ।

প্রাচীন আর্য্য সভ্যতায় নারীদিগের স্থান বেশ উচ্চ ছিল। অনেকে বিবাহ করিয়া গৃহিণী হইতেন—ভগবান্ মনুর ভাষায়

গৃহের শ্রী হইতেন। কেহ কেহ অন্দরে থাকিয়া ব্রহ্মবাদিনী হইয়া ব্রহ্মচিন্তায় জীবনযাপন করিতেন। প্রাচীন যুগে রাণী দময়ন্তী,—নল রাজা দ্যূত ক্রীড়ায় উন্মত্ত হইলে সচিবেরা সেই সংকটে যাঁহার পরামর্শ লইয়াছিলেন; গান্ধারী, যিনি নৃপতি ও রাজন্য ভূপতিগণের মণ্ডলীর মধ্যে মদান্ধ পুত্র দুর্য্যোধনকে হিতবাণী শুনাইয়াছিলেন; আধুনিক সময়ে চিতোরের রাণী পদ্মাবতী, মারগাড়ের মধুর স্ত্রী-কবি মীরাবাই, টোড়ার বীর-নারী তারাবাই, আমেদনগরের রক্ষাকর্ত্রী চাঁদবাই, ইন্দোরের প্রসিদ্ধ রাণী অহল্যাবাই—এই সকল এবং আরও অসংখ্য নারীর ইতিহাস ভারতরমণীর শ্রেষ্ঠতার যথেষ্ট নিদর্শন।

কেবল বিগত ৫।৬ পুরুষ ধরিয়া ভারত-নারী আর স্বামীর পার্শ্বচারিণী নহেন—জনহিতকর কার্য্যে আর স্বামীর সহায়তা করেন না। এখনও তাঁহারা পতিপুত্রের উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব করেন, কিন্তু সহায়দাত্রী হইবার জন্য যে বিজ্ঞতার প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের নাই। সুশিক্ষা তাঁহাদের মধ্য হইতে কখনই তিরোহিত হয় নাই, তবে পতিপুত্র ইংরাজ-শিক্ষিত, সংস্কৃত প্রাকৃতের চর্চা করেন নাই—সেই জন্য পুরুষের শিক্ষা ও নারীর শিক্ষার মধ্যে স্বভাবতঃ একটী ব্যবধান গঠিত হইয়াছে, তাহার ফলে তাঁহারা পুরুষদিগের ব্যাপকতর জীবনের সহিত আগেকার মত আর সহানুভূতি করিতে পারিতেছেন না। এক দিকে স্বামীদিগের লক্ষ্যস্থল প্রসৃত হইতেছে, অন্য দিকে স্ত্রীদিগের লক্ষ্যস্থল সংকীর্ণ হইতেছে। স্বামীদিগের মধ্যে ধর্ম্মহানি হওয়াতে তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে স্ত্রীদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুদার ও অজ্ঞানাবদ্ধ হইতেছে। পূর্ব্বের মত স্বামী আর স্ত্রীর ধর্ম্মশিক্ষক নাই। স্ত্রীকে এখন ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য পুরোহিতের শরণাপন্ন হইতে হইতেছে। তাহার ফলে ধর্ম্ম এখন নগ্ন ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে, এবং জ্ঞানের শুভ্র জ্যোতিতে আলোকিত না হওয়াতে

ঐ ধর্ম্ম সহজেই কুসংস্কারে ও ভাবহীন ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অবনত হইতেছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন ধর্ম্মশিক্ষাকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিবার জন্য একটা অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়, তখন ঐ চেষ্টার সহিত ভারত-রমণীরা যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় যুবকদিগের হৃদয়ে যে নাস্তিক্যের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল, ঐ অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার প্রতীকারের সম্ভাবনা ছিল। বর্ত্তমান যুগে বোধ হয় ঐ অনুষ্ঠানই সর্ব্বপ্রথম ভারতরমণীগণের মধ্যে একটা দেশব্যাপী আগ্রহ ও অনুরাগ উত্তেজিত করিয়াছিল।

তাহার পর ভারতের বাহিরে ভারতবাসীর নির্য্যাতন দেখিয়া ভারত-রমণীর স্বভাবসিদ্ধ সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। পরে যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় বিবাহের পবিত্রতার উপর আক্রমণ করা হইয়াছিল, তখন সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করিবার জন্য তাঁহারা দলে দলে বাহির হইয়াছিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের তীব্র অসন্তোষ উৎপন্ন করিয়াছিল, এবং তাঁহাদিগের বহির্মুখী হইবার অন্যতম নিদান হইয়াছিল। যখন এক চরমপন্থী সংবাদপত্রের সম্পাদক রাজদ্রোহের জন্য অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তখন ৫০০ শত বঙ্গনারী তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুঃখনিবেদন দ্বারা নয়, অভিনন্দন দ্বারা আপনাদের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতেই সদ্‌বংশজাতা বঙ্গনারীর হৃদয়ের পরিচয় জানা যায়।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমজীবীদিগের দুর্দ্দশা লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারাও ভারতরমণীগণ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। কারণ, উহার সহিত

নারী জাতির মান অপমান জড়িত ছিল, এবং ঐ উপলক্ষে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া বড়লাটের নিকট দরবারও করিয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, ভারতীয় নারী জাতির জাগরণের বোধ হয় উহাই প্রধান কারণ। কিন্তু ইহার উপর আর একটা গভীরতর কারণ বিদ্যমান ছিল। ভারতমাতার কন্যাগণের হৃদয়ের অন্তস্তলে জননীর বাণী বাজিয়া উঠিয়াছিল। সে বাণী স্বরাজের বাণী, নিজের দেশে রাণী হইবার জন্য ভারতমাতার সহায় হইবার আহ্বান বাণী তাহাদের হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের স্তন্য-পানে পুষ্ট, রমণীর পূর্ণ আদর্শের উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত ভারত-দুহিতৃগণ ভারত-স্বাধীনতার বৃহৎ চেষ্টায় উদাসীন থাকিতে পারেন নাই, এবং গত কয় বৎসরে স্বদেশ-প্রেমের সন্ধুক্ষিত অগ্নি—যাহা বহুদিন তাঁহাদের হৃদয়ে তুষানলের মতন জ্বলিতেছিল—এবং যে ধর্ম্মকে তাঁহারা প্রাণের সহিত ভালবাসেন, সেই ধর্ম্মের প্রভাবহানিদর্শনে প্রদীপ্ত রোষানল বিদেশী শাসনের প্রতি সহজাত বিরাগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে এক অপূর্ব্ব জাগরণের সঞ্চার করিয়াছিল। ফলতঃ বহুসংখ্যক ভারতীয় নারীর সহানুভূতি-লাভের ফলে হোমরুল-অনুষ্ঠানের শক্তি দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা উহার মধ্যে রমণীসুলভ তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ বীর্য্য আনয়ন করিয়াছেন। আমাদের হোমরুল-লীগের ভারতরমণীগণই শ্রেষ্ঠ রংরুট ও রংরুট-কর্ত্রী। মান্দ্রাজ-রমণীরা আজও গর্ব্ব করেন যে, যখন পুরুষদের শোভাযাত্রা রাজাজ্ঞায় স্থগিত হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের শোভাযাত্রা বন্ধ হয় নাই, এবং মন্দিরে মন্দিরে অনুষ্ঠিত তাঁহাদেরই পূজা অন্তরীণে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান করিয়াছিল।

প্রথমতঃ ভারতের পুণ্যতীর্থের মন্দির সকলে, এবং সেই তরঙ্গ পল্লীগ্রামে

পঁহুছিলে গ্রামস্থ মন্দিরসমূহে প্রদত্ত পূজা, প্রার্থনা ও সাধু সন্ন্যাসীদিগের দেশব্যাপী প্রচারকার্য্যের ফলে ধর্ম্মের সহিত স্বরাজ এরূপ একতা-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতরমণী ও ভারতীয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে এখন উভয়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। উচ্চ বর্ণের ভারতরমণীও পল্লীবাসী নরনারীকে স্বরাজের পক্ষপাতী করিবার ইহাই এ দেশে সুনিশ্চিত উপায়। সেই জন্য আমি বলিতেছিলাম যে, 'স্বরাজ' এই তিনটি অক্ষর এখন একটী মন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

(চ) সাধারণ জনশ্রেণীর জাগরণ।

বর্ত্তমান সময়ের ইহা আর একটি অতি বিস্ময়কর ঘটনা। পূর্ব্বে সাধুসন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক যে প্রচার ও সমবেত প্রার্থনা প্রবর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ফলে পূর্ব্ব হইতেই জাগরণ আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এই জাগরণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহুবর্ষব্যাপী নিয়ত প্রভাবের দ্বারাই অধিকপরিমাণে সফল হইয়াছে। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণ জনশ্রেণীর সহিত অসংশ্লিষ্ট নহে। এ সম্প্রদায়ের মূল পল্লীজীবনের গভীর প্রদেশে নিহিত, ইহা আমরা ক্রমে আলোচনা করিব। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রায়তরা ইংরাজী আদৌ জানে না বটে, কিন্তু তাহাদের একরকম বিদ্যা আছে। এই বিদ্যা স্মরণাতীতকাল হইতে প্রচারিত প্রাচীন কিংবদন্তী, উপাখ্যান, কাহিনী প্রভৃতির সাহায্যে অর্জ্জিত হয়। ভারতীয় রায়ত ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের বিধানও সে জানে, সে শ্রমশীল ও চতুর। 'সরকার' কে, তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না, তবে সরকারের যে কর্ম্মচারী কর আদায় করিতে আসে, এবং তাহার জমীতে হস্তক্ষেপ করিতে আসে, তাহার সম্বন্ধে তাহাকে বিশেষভাবে ভাবিতে হয়। প্রাচীনকালে পঞ্চায়েত গ্রামের সমুদয় কার্য্য পরিচালনা করিতেন, তখন রায়তের অবস্থা ভাল

ছিল, সে সন্তুষ্টচিত্তে দিনযাপন করিত, রাজার কর-আদায়কারী আসিলে বা সৈন্যগণ গ্রাম আক্রমণ করিলে তাহার অবস্থার কিছু ব্যতিক্রম হইত। এই সমুদয় ব্যতিক্রম, অনাবৃষ্টি বা বন্যার মত, অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক দুর্বিপাক। গ্রামে লুণ্ঠন হইলে, বা শত্রুরাজা গ্রাম আক্রমণ করিলে, প্রজাগণ ইহা বেশ অনুভব করিত যে, তাহাদের রাজা যেমন অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাহারাও সেইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতেছে; আর যে কর সংগৃহীত হইতেছে, তাহার সুবিধা রাজাও যেমন উপভোগ করিতেছেন, তাহারাও সেইরূপ উপভোগ করিতেছে। কিন্তু এখন কি হইয়াছে? এখনকার বিধি-নিষেধ-সংবদ্ধ শাসন-পদ্ধতি ঠিক যেন চেতন মনুষ্য-সমবায়ে একটি যন্ত্র; সেই চেতন লৌহযন্ত্রের নিষ্পেষণে প্রজাবর্গ জর্জ্জরিত; পূর্ব্বে শাসন-যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে যে সহৃদয় মানবতার সম্বন্ধ-বন্ধন ছিল, এখন আর তাহা নাই।

"হোমরুলে"র কথা গ্রাম্যজীবনের মধ্য দিয়া রায়তকে স্পর্শ করিয়াছে—বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা তাহাকে যে কত প্রকারে ক্লিষ্ট করিতেছে, তাহা কৃষির অবস্থা-বর্ণনার সময় নির্দ্দেশ করিব। নির্দ্দিষ্ট নগদ খাজানা দেওয়ার যে কড়াকড়ি বিধান, তাহাতে সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে—"শস্য যেমন উৎপাদিত হইবে, রাজাকে তাঁহার অংশ পরিমাণমত আদায় দিব"—এই বিধানের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ জমীর মাপ ও খাজানা-নির্দ্দেশের ব্যবস্থায় বেশী খাজানা দিবার জন্য তাহাকে মহাজনের নিকট টাকা ধার করিতে হয়, এই ব্যবস্থায় সে ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রাচীন পঞ্চায়েত-প্রথা আবার ফিরিয়া পাইতে চায়। সে চায় যে, তাহার গ্রামের সমুদয় কার্য্য তাহার ও তাহার গ্রামবাসিগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রাচীন সমাজের সুনিপুণ সেবকগণের স্থান অধস্তন রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। এই সমুদয় রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচার হইতে সে পরিত্রাণ পাইতে চায়।

সাধারণ জনশ্রেণীর এই জাগরণ যে সমুদয় কারণের সাহায্যে সাধিত হইয়াছে, তাহার তালিকা হইতে যৌথ-সমিতির আন্দোলনের প্রভাব এবং গ্রামের ও গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যবিধান ও অন্যান্য সাধারণের হিতকর ব্যাপার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের গ্রামে যাতায়াতের প্রভাবকেও বাদ দেওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত মোরল্যাণ্ড ও শ্রীযুক্ত ইউ'য়ং, "কোয়াটারলি রিভিউ" পত্রে লিখিত প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"প্রধানতঃ যৌথ-সমিতির আন্দোলনের দ্বারা সমবেতভাবে কার্য্য করিবার শক্তির যে উন্নতি ও বিকাশ হইয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান সময়ে কৃষকগণের মনোভাবের পরিবর্ত্তন জড়িত রহিয়াছে। গত দশ বৎসরে যে সফলতা হইয়াছে, ইহাই তাহার স্থায়ী ফল, এবং যাহারা কৃষির সংস্কার ও উন্নতিকামী, তাঁহারা যে আজকাল আশাময় বিশ্বাসের সহিত ভবিষ্যতের কল্পনা করিতে পারেন, এইটিই তাহার প্রধান ভিত্তিস্থল।"

দেশের নানা স্থানে সভাসমিতির কার্য্য এখন সর্ব্বসাধারণের কথিত ভাষায় পরিচালিত হয়, বহুসংখ্যক রায়ত দলে দলে এই সকল সভাসমিতিতে উপস্থিত হয়, এবং স্থানীয়-ব্যাপার-সংক্রান্ত যে সমুদয় কার্য্যকরী আলোচনা হইয়া থাকে, তাহাতে যোগদান করে। এখন তাহারা আশার সহিত বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, এই যে বৃহৎ জাতীয় আন্দোলন, তাহারাও ইহার অংশী, এবং তাহাদেরও ভাল দিন আসিতেছে।

উপেক্ষিত জাতিসমূহও আশালোকের স্পর্শ অনুভব করিয়াছে, এবং তাহাদের নত-শির উত্তোলিত করিতেছে। ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর স্পষ্টভাবে তাহাদের জননী জন্মভূমির গৃহপ্রাঙ্গনে তাঁহারা তাহাদের স্থান দাবী করিতেছে। কোনও কোনও আন্দোলন তাহারা আপনা-আপনিই সৃষ্টি করিয়াছে, আবার কোনও কোনও আন্দোলন উচ্চতর জাতি-

গণের দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে। এই সমুদয় আন্দোলন তাহাদের মধ্যে একটা আত্মসম্মান-বোধ উদ্দীপিত করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা আজ জাগ্রৎ হইয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহারা বহুকাল তাঁহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মে হেলা করিয়াছেন; এইরূপ বুঝিয়া তাঁহারা এই সকল উপেক্ষিত জাতিকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। এখন বৎসরের পর বৎসর এই সমুদয় উপেক্ষিত জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।

আজ উন্নত জাতিগণ বুঝিতেছেন যে, তাঁহারা যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তেমনই ফল ফলিয়াছে; তাই ন্যায়ের বিধানে সরকারী ও বেসরকারী ইউ-রোপীয়গণ এই সমুদয় জাতি যাহাতে "হোমরুল"এর বিরোধী হয়, সে জন্য তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। এই সমুদয় উপেক্ষিত জাতি এতদিন যে ঘৃণার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ঘৃণার উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে বলা হইতেছে যে, যদি "ব্রাহ্মণ-শাসন" আবার ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহারা আবার সেই ভাবে ঘৃণিত হইবে। কুড়ি বৎসর অগে এবং তাহারও পূর্ব্বে আমি সাহসের সহিত হিন্দু-সমাজকে এই আসন্ন বিপদের কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম। উপেক্ষিত জাতিগণকে অবহেলা করা হইয়াছিল—তাহারা দেখিতেছে যে, খ্রীষ্টান অথবা মুসলমান হওয়া তাহাদের পক্ষে লাভজনক, তাহাতে তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই যে ব্যাপার, ইহার ভিতর যে বিপদ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সে বিপদের কথাই আমি বলিয়াছিলাম। সেই অবধি কিছু কিছু কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে সিন্ধুর প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র হইয়াছে। অবশ্য তাহারা বেশ ভাল করিয়াই জানে যে, কেবল উচ্চতম জাতিগুলিই নহে; সকল জাতিই তুল্যরূপে অপরাধী। কিন্তু সে সান্ত্বনা ত সান্ত্বনা নহে, ইহাও দুঃখের কথা। বড়ই সুখের বিষয় এই যে, তাহাদের মধ্যে এখন বহুসংখ্যক লোক অতীতকে ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছুক, এবং স্বদেশবাসী সকলের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য

সমবেতভাবে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক। মাতৃভূমির প্রত্যেক ভক্তসন্তানের এখন এই সমুদয় উপেক্ষিত সন্তানগণকে জননীর সাধারণ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত গান্ধীর সঙ্কল্প অতি চমৎকার। জাতীয় মহাসমিতি ও মুসলমান-সমিতির শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবের সমর্থন জন্য এক অতি বৃহৎ আবেদনপত্র প্রস্তুত হউক, এবং এই প্রস্তাবের তাৎপর্য্য সর্ব্বত্র বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া লোকের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হউক। এই চেষ্টার দ্বারা অতি সুন্দর রাজনৈতিক প্রচারকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সকলে বুঝিতে পারে, এমন সাহিত্য খুব বিস্তৃতভাবে বিতরণ করিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশে ক্ষেত্র বেশ সুন্দররূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রচার-সমিতি সমগ্র প্রদেশে দেশের প্রচলিত ভাষায় হোমরুলের সরল ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছে। গত বৎসর এই ভাবে গ্রামে গ্রামে কার্য্য করায় এই ফল হইয়াছে যে, প্রায় দশ লক্ষ স্বাক্ষর সংগৃহীত হইয়াছে। এই স্বাক্ষর দুইটি করিয়া লওয়া হইয়াছে, কাজেই "হোমরুলের" পক্ষপাতী বহুসংখ্যক লোকের নাম আমাদের নিকট আছে—এই লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, এবং ভবিষ্যৎ স্বাধীনতালাভের যাত্রীর বিরাট দল গঠিত হইবে।

ভারতবর্ষ কেন 'হোমরুল' চায় ?

দুইটি কারণে ভারতবর্ষ 'হোমরুল' চায়। একটি কারণ অন্তরঙ্গ, তাহা প্রাণের কথা; আর একটি কারণ অত্যাবশ্যক নয়, কিন্তু খুব গুরুতর। প্রথম কারণ এই যে, স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির জন্মসিদ্ধ দাবী; দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থ, এখন তাহা ভারতবর্ষের সম্মতি ব্যতীত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের করতলগত, এবং ভারতবর্ষের

নিজের সম্পদ্, তাহার নিজের যে সমস্ত প্রধান প্রধান অভাব, তাহা পূরণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় না। কেবলমাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সমর-বিভাগের জন্য ভারতের যে অর্থ ব্যয় হয়—ভারতরক্ষার জন্য নহে, সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে,—তাহার তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয় কত নগণ্য ?

(১) অন্তরঙ্গ হেতু।

(ক) জাতি কাহাকে বলে ?

প্রত্যেক জাতির আত্মসম্মান ও মহত্ত্বের জন্য স্বায়ত্তশাসন আবশ্যক। বৈদেশিকের শাসন শাসিত জাতিকে বিকলাঙ্গ করে, তাহার চরিত্রকে অবনত করে, এবং তাহার শক্তিকে খর্ব্ব করে। অস্ত্র-আইনের দ্বারা কি না অনিষ্ট ঘটিয়াছে ? জাতীয় মহাসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে রাজা রামপাল সিংহ বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজ-শাসনে দেশের যে সমস্ত সুবিধা হইয়াছে, তাহা এক দিকে, আর অস্ত্র-আইনের অনিষ্টকারিতা আর এক দিকে রাখিয়া ওজন করিলে ঐ অনিষ্টকারিতাই অধিক হইবে। অস্ত্র-আইন ভারতের মনুষ্যত্বকে দুর্ব্বল ও ধিক্কৃত করিয়াছে। রাজা রামপাল সিংহ আরও বলিয়াছিলেন, "এই বিধান আমাদের প্রকৃতিকে অবনত করিয়াছে, নিয়তভাবে আমাদের সামরিক শক্তিকে চূর্ণ করিয়াছে, সৈনিক ও বীরের জাতিকে ভীরুস্বভাব মসীজীবী মেষপালে পরিণত করিয়াছে। আমরা এই বিধানের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পারি না।" মানুষ সর্ব্বদা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলা ফেরা করিতে পারে না বলিয়া যে এরূপ হইয়াছে, তাহা নহে; ইংলণ্ডেও কেহ সর্ব্বদা অস্ত্র লইয়া বেড়ায় না—কিন্তু দেশবাসীর অস্ত্র-ব্যবহারের অধিকার কাড়িয়া লওয়ায় এইরূপ হইয়াছে। স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কোনও জাতি বা কোনও ব্যক্তিবিশেষ তাহার শক্তির পূর্ণ

বিকাশ-সাধন করিতে পারে না। ভারতবর্ষ ছাড়া এ কথা সর্ব্বত্রই স্বীকৃত। ম্যাট্‌সিনি যথার্থই বলিয়াছেন—"জগদীশ্বর তাঁহার চিন্তার একটী লিপি প্রত্যেক শিশুর দোল্‌নার উপর লিখিয়া রাখিয়াছেন। সেইটীই তাহার জীবনের বিশিষ্ট পরমার্থ। তাহার অপলাপ হইতে পারে না। অবাধে তাহার বিকাশ না হইলেই নয়।"

কারণ, জাতি বলিতে কি বুঝায়? এক একটি জাতি ব্রহ্মরূপ অগ্নির এক একটি স্ফুলিঙ্গ—পরমেশ্বরের একটি একটি বিশিষ্ট অংশ জগতের মধ্যে নিঃশ্বসিত হইয়া বহুসংখ্যক নরনারী ও শিশুকে এক জনসংঘে গ্রথিত করিয়া এক একটি জাতিরূপ শরীর গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক জাতির গুণসমূহ, তাহার শক্তিসমূহ, এক কথায় তাহার প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা তাহার প্রাণভূত সেই ঐশ-জীবনের অংশের উপর নির্ভর করে—সেই ঐশ-জীবন উহাকে আকৃতিদান করিতেছে, বিকশিত করিতেছে, বিশেষ বর্ণে রঞ্জিত করিতেছে, এবং উহাকে একত্বে পরিণত করিতেছে। জাতীয় ভাবের ইন্দ্রজাল একত্ববুদ্ধি—একটী বিশেষ ভাব আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর সেবা করা; সে বিশেষ ভাব রক্ষা করিবার জন্য ইহার প্রকৃতিগত বিশিষ্টতার প্রয়োজন আছে—সেই বিশেষ-ভাবে বিশ্বমানবের সেবা করাই জাতীয় জীবনের উপযোগিতা ও সার্থকতা। ইহাকেই ম্যাট্‌সিনি তাহার "বিশিষ্ট পরমার্থ" বলিয়াছেন—জাতির জন্মকালেই ঈশ্বর তাহাকে সেই কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়াছেন। এইহেতু ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের পরমার্থ, পবিত্রতার ভাব পারস্যের, বিজ্ঞান মিশরের, সৌন্দর্য্য গ্রীসের, বিধি রোমের বিশিষ্ট পরমার্থ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ সেবা করিতে হইলে প্রত্যেক জাতিকে নিজের আত্মপ্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিয়া বিকাশ লাভ করিতে হইবে, নিজের ক্রম-বিকাশ-সাধনের ব্যবস্থা তাহার নিজের হাতেই লইতে হইবে। সে যাহা—

ঠিক তাহাই হইবে, অন্য কিছু হইবে না। একটী জাতির যাহা বিশ্বমানবকে দিবার আছে, তাহা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই সেই জাতির বিশিষ্ট জাতীয়তা যদি বিকৃত বা বিকাশে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে সমগ্র বিশ্বেরই ক্ষতি।

(খ) স্বায়ত্তশাসনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা।

এই কারণে কোনও জাতি যখন স্বাধীনতার জন্য বা স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য একান্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তখন সেই আকাঙ্ক্ষা কেবল মাত্র স্বার্থপরতা হইতে উদ্ভূত অধিকতর সুখ সম্ভোগের অধিকার লাভ করিবার দাবী নহে। এমন কি, তাহাও যদি হয়, তাহা হইলেও তাহাতে কোনও দোষ নাই ; কারণ, সুখ বলিলে জীবনের পূর্ণতা বুঝায়, এবং সেই পূর্ণতার উপভোগ একটি ন্যায্য দাবী। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের দাবী বিশ্বমানবের সেবার উদ্দেশ্যে নিজের প্রকৃতির বিকাশসাধনের দাবী। এই দাবী অন্তরতম আধ্যাত্মিকতার দাবী—নিজের যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ, তাহাই বিশ্বকে দান করিবার যে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। কাজেই বিপদরাশি ইহাকে দলন করিতে পারে না, ভ্রূকুটী ইহাকে ভীতিকাতর করিতে পারে না, অধিকতর সুখ-সম্ভোগের প্রলোভন ইহাকে তাহার স্বাধীনতার দাবী পরিত্যাগ করাইতে পারে না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী উক্তির কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া এ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে বলিতে হয় যে, সে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার সহিত হুঙ্কার করিয়া "একটি জাতি যদি সমগ্র পৃথিবী লাভ করে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে তাহার পরমাত্ম-শক্তিটি হারায়, তাহাতে তাহার লাভ কি? তাহার পরমাত্ম-শক্তির বিনিময়ে একটী জাতিকে তুমি কি দান করিবে?" দুঃখ কষ্টই ভাল, যদি তাহার সহিত স্বাধীনতা পাই, ভোগ বিলাসের সঙ্গ।

দাসত্বে প্রয়োজন নাই। 'হোমরুল'-আন্দোলনের ইহাই প্রাণের কথা—কাজেই ইহাকে দমন করা যায় না, বিনাশ করা যায় না, ইহা সনাতন ও চিরতরুণ। আমলা-তন্ত্রের দক্ষতার লোভ দেখাইয়া কাহাকেও তাহার জন্মসিদ্ধ দাবী কখনই ছাড়াইতে পারা যাইবে না।

(গ) জাতীয় বিকাশের অবরোধ।

দেশবাসিগণের দৈনন্দিন জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে, প্রত্যেক পুরুষ, প্রত্যেক নারী ও প্রত্যেক শিশুর চরিত্র যে বৈদেশিক শাসনের দ্বারা অধঃপাতিত ও দুর্ব্বলীকৃত হইতেছে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।—এবং শ্রেষ্ঠ ভারতবাসিগণ বড়ই বেদনার সহিত ইহা অনুভব করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন।

সরকারী কার্য্যে দেশবাসার নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন—"বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির ফলে আমাদের জাতি ক্রমশঃ বামন হইয়া যাইতেছে। চিরজীবন আমাদের হীনতার আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে হইতেছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাংশুতম, তাঁহাদিগকেও ন্যুব্জ হইয়া চলিতে হইতেছে—নহিলে শাসননীতির প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। যে ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণা ইংলণ্ডের ইটন বা হ্যারো বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রই অনুভব করে—একদিন সেও এক জন গ্লাড্‌ষ্টোন্, এক জন নেল্‌সন্, বা এক জন ওয়েলিংটন হইতে পারে, যে উচ্চ আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া, তাহার সমস্ত উদ্যম ক্রিয়াশীল হয়, সে ভাবের আস্বাদে আমাদের বঞ্চিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির অধীনে আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব যে পরিপূর্ণ উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম, সে উন্নতি লাভ করিতে পারি না। স্বায়ত্ত-শাসনশাসিত জাতিসমূহ নৈতিক জীবনের যে মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারে,

আমাদের তাহা অনুভব করিবার উপায় নাই। একেবারে অব্যবহারের ফলে আমাদের রাজ্যশাসনের ক্ষমতা, আমাদের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতাও নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে লোপ পাইবে; তাহার পর পরের জন্য কাঠ কাটা আর জল তোলার বৃত্তি আমাদের ভাগ্যে চিরস্থায়ী হইয়া যাইবে।"

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুও ঠিক এই ভাবেরই কথা বলিয়াছেন, —"আমলা-তন্ত্র শাসনপদ্ধতি, যাহা বিদেশ হইতে আমদানী করা লোকের দ্বারা চালিত—যাবতীয় শক্তি তাহাদেরই হাতে কেন্দ্রীভূত, যাবতীয় দায়িত্ব-ভার তাহাদের উপরই ন্যস্ত; এই ব্যবস্থা ভারতের আত্মার উপর একটা মরণের বোঝার মত চাপিয়া আছে—আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতেছে—মাথা খাটাইতে হয় না বলিয়া আমরা অধঃপাতে যাইতেছি, কর্ম্মশক্তির স্নায়ুগুলি চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িতেছে—এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ব্যাপার এই হইতেছে যে. ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে আমাদের আত্মসম্মান-বোধ একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।"

কুপার্স হিল্ কলেজের ছাত্রগণের প্রতি লর্ড সলসবরীর উপদেশবাণী এই প্রসঙ্গে বেশ সার্থক, "শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ যদি শাসিতগণের হীনতাবোধ ও মনস্তাপের দ্বারা কলুষিত হয়, তাহা হইলে সে শাসন-ব্যবস্থা কথনই স্থায়িরূপে নিরাপদ নহে। যাহারা এ দেশ ছাড়িয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতে যাইতেছে, তাহাদের হৃদয়ে আমি এই উপদেশ-টুকু বিশেষভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই। তাহারা যদি ঐ ভাবে কাজ করে, তাহা হইলে তাহারাই ইংলণ্ডের ভয় করিবার মত একমাত্র শত্রু। তাহারাই ইচ্ছা করিলে ইংলণ্ডের ভারত-শাসনের ভবিষ্যতের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে।"

এই বিপদের কথা আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি। ভারত-বাসিগণের আত্মসম্মানবোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, ইদানীং ঐ বিপদ

আরও বাড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রদেশে সত্যগোপনই শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হয়।

জাতীয় বিকাশের এই অবরোধ শিশুদিগের শিক্ষাদান হইতেই আরব্ধ হয়। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় ইংরেজ ও ভারতবাসী শিক্ষকের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, কলেজেও তাহাই। ছাত্রেরা দেখিতে পায়, প্রথমশ্রেণীর ভারত-বাসিগণকে অতিক্রম করিয়া তৃতীয়শ্রেণীর অপরিপক্ক বিদেশী উচ্চপদ পাইতেছে। বিদেশী ভিন্ন কাহারও কলেজের অধ্যক্ষ হইবার অধিকার নাই। ভারতের ইতিহাস অপেক্ষা বিদেশের ইতিহাস অধিক প্রয়োজনীয়। ইংলণ্ডের গ্রাম সম্বন্ধে যিনি কিছু লিখিয়াছেন, ভারতের অর্থনীতিশাস্ত্র পড়াইবার গুণ তাঁহার আছে। স্কুলের ও কলেজের সমস্ত বায়ুমণ্ডল বৈদেশিকের প্রাধান্যের নিদর্শনে পরিপূর্ণ—এমন কি, অধ্যাপকেরা যখন এ কথা প্রকাশ করিয়া নাও বলেন, তখনও তাহা অনুভব করা যায়। কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, শিক্ষাবিভাগ তাহা নিয়ন্ত্রিত করেন—বিদেশের আদর্শে ইহা স্থিরীকৃত হয়—এবং ইহার উদ্দেশ্য—বৈদেশিকের স্বার্থসাধন, স্বদেশের নহে। স্বদেশপ্রেমিক রাজনৈতিক-দায়িত্ববোধসম্পন্ন সামাজিক প্রস্তুত করা ইহার উদ্দেশ্য নহে, বেশ পোষমানা সরকারী কর্ম্মচারী প্রস্তুত করাই ইহার উদ্দেশ্য। উন্নত তেজস্বিতা, সাহস, আত্মসম্মানবোধ এ সকলকে উৎসাহ দেওয়া হয় না। বেশ পোষমানা 'গো-বেচারা' হওয়ার যোগ্যতাই ছাত্রদিগের মধ্যে বেশ ভালগুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশের জন্য গর্ব্ববোধ, দেশহিতৈষণা, উচ্চাভিলাষ, এ সমস্ত বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষীয় আদর্শসমূহের পরিবর্ত্তে বিলাতী আদর্শসমূহের গুণ-কীর্ত্তন করা হয়। বৈদেশিক [redacted] সুফল এবং নিজেদের কার্য্য-পরিচালনায় ভারতবাসীর অক্ষমতা—সকল সময়েই উপদিষ্ট হয়। এই প্রকারে যে সমুদয় বালক শিক্ষালাভ করে,

তাহারা যখন বড় হয়, তখন তাহারা মতলব-বাজ ও চাটুকার হইয়া পড়ে। ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে! তাহারা যখন দেখে যে, তাহাদের ন্যায়সঙ্গত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিফল হইতেছে, তখন অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে, এবং সাধারণের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে আদৌ বিবেচনা করে না।—তাহারা যে হীন, এই কথাটা, তাহাদের হৃদয় যখন কোমল থাকে, সেই সময়ে তাহাদের হৃদয়ে এমন করিয়া মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহারা সেই জিনিসটা অনুভবই করিতে পারে না, যাহাকে এস্‌কিথ সাহেব "বৈদেশিক শাসনের অসহনীয় অবমাননা" বলিয়াছেন।

(ঘ) ভারতবর্ষের দাবী।

এই শাসন ভাল কি মন্দ, ইহা আদৌ বিচার্য্য নহে। ইংলণ্ডে ইংরাজ-শাসনের সাফল্য অপেক্ষা জর্ম্মণীতে জর্ম্মণ-শাসনের সাফল্য ঢের বেশী। জর্ম্মণরা ভাল খাইতে পায়, তাহাদের আমোদ-প্রমোদ ও বিশ্রামের অবকাশও অধিক। ইংলণ্ড অপেক্ষা সেখানে দারিদ্র্যের পেষণও কম। কিন্তু তাই বলিয়া কি কোন ইংরেজ ইচ্ছা করে যে, ইংলণ্ডের যত বড় বড় পদ জর্ম্মণরা আসিয়া দখল করুক! কেন তাহা করে না? কারণ এই যে, বৈদেশিক শক্তির দাসত্ব যতই ভাল হউক, স্বাধীন মানবের ধর্ম্মসঙ্গত আত্ম-সম্মানবোধ ও মহত্ত্ব-বোধ তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হইয়া থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভে মিষ্টার এস্‌কিথ্ বলিয়াছিলেন,—"এ প্রকারের অবস্থা ধারণাতীত এবং অসহনীয় হইবে।" আচ্ছা, তাহা হইলে এই পদ্ধতি একালে এই ভারতবর্ষে একমাত্র 'ধারণাযোগ্য' পদ্ধতি হইল কিরূপে? কেন সমুদয় ভারতবাসী কর্ত্তৃক ইহা অসহনীয় বলিয়া অনুভূত হইবে না? কারণ এই যে, শিশুকাল হইতে এই ভাবের মধ্যে লালিত পালিত হওয়ায়, 'সাহেব লোকেরা স্বভাবতঃই আমাদের অপেক্ষা বড়' এই ধারণা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে।

ইংরেজ-শাসনে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট এই হইয়াছে যে, ইহা স্বাধীন মানবমাত্রেরই স্বাবলম্ব ও আত্মস্থ হইবার যে সহজাত অধিকার, তাহা হইতে ভারতবাসিগণকে বঞ্চিত করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় পরিচ্ছদ, ভারতবর্ষীয় খাদ্য, ভারতীয় জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, ভারতীয় আচার-নিয়ম, এ সমস্তই নিম্নস্তরের বলিয়া বিবেচিত হয়; ভারতের মাতৃভাষা ও ভারতের সাহিত্যের দ্বারা লোকে পণ্ডিত হয় না। ভারতবাসিগণ ও ইংরেজগণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া ধরিয়া লন যে, প্রত্যেক জাতির যাহা স্বাভাবিক অধিকার, ভারতবাসীদের তাহা নাই। ভারতবাসিগণ তাহাদের দেশের সমগ্র শাসনের অধিকার দাবী না করিয়া দেশ-শাসনে আর একটু বেশী অধিকারমাত্র ভিক্ষা করে, এবং তাহাদিগকে কিছু বর বা সুবিধা দিলে ইংরেজ আশা করে যে, তাহারা কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। যেন বৃটনেরই অধিকার—সে কি দিবে। সমস্ত ব্যাপারই উদ্‌ভ্রান্ত, বিপর্য্যস্ত ও অযৌক্তিক। ভগবানকে ধন্যবাদ যে ভারতের চক্ষু খুলিতেছে। ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে এখন লক্ষ লক্ষ লোক উপলব্ধি করিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ, নিজের দেশে মানুষমাত্রেরই যে স্বাধীনতার অধিকার, তাহা তাহার আছে, তাহার নিজের দেশের কাজকর্ম্ম পরিচালন করিবার অধিকার তাহার আছে। আর ভারতবর্ষ জানু পাতিয়া বসিয়া বরভিক্ষা করিতেছে না, এখন পায়ের উপর দাঁড়াইয়া তাহার অধিকার দাবী করিতেছে। আমি এই সব প্রচার করি বলিয়া ভারতপ্রবাসী ইংরাজেরা আমাকে ভুল বোঝে, এবং আমাকে রাজদ্রোহী বলে; আমি এই সব শিক্ষা দিয়াছি বলিয়াই আজ আমি এই জাতীয় মহাসমিতির সভানেত্রী।

মনে হইবে যে, এ ভাষা বড় তীব্র; কারণ স্পষ্ট সত্য কথা ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বলা হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডে প্রত্যেক ইংরাজ নিজের দেশের জন্য এইরূপই অনুভব করে, এবং ভারতবর্ষে প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বদেশের

জন্য এইরূপই অনুভব করা উচিত। এ সেই স্বাধানতা, যাহার জন্য মিত্র-শক্তিপুঞ্জ যুদ্ধ করিতেছেন—ইহারই নাম প্রজাতন্ত্র, ইহাই এ যুগের কাল-প্রভাব। ইহা ঠিক তাহাই—যাহা প্রত্যেক প্রকৃত ইংরাজ যেমন ভারতবর্ষ দাবী করিবে, অমনি ইহাকে ভারতের ন্যায্য দাবী বলিয়া অনুভব করিবে। ভারতবর্ষ যখন এই অধিকার পাইবে, তখন ভারতবর্ষ ও গ্রেটব্রিটেনের সম্বন্ধ-বন্ধন পরস্পরের প্রীতি প্রেম ও সেবা-বিনিময়ের স্বর্ণতন্তুতে পরিণত হইবে—বৈদেশিক দাসত্বের লৌহরজ্জু তখন খসিয়া পড়িবে। আমরা একত্র পাশাপাশি বাস করিব, এবং একসঙ্গে কাজ করিব, কোনরূপ অবিশ্বাস বা অপ্রীতি থাকিবে না—একই লক্ষ্য লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন কাজ করে, ঠিক সেইরূপ করিব। আর সেই মিলন হইতে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ সাম্রাজ্যের বা গণতন্ত্রের উদ্ভব হইবে; পৃথিবী তেমনটি কখনও দেখে নাই; আর ভগবানের ইচ্ছায় সুসময় হইলে তাহারাই পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে।

(২) গৌণ হেতুসমূহ।

(ক) সাফল্যের পরীক্ষা

'হোমরুলে'র জন্য এখন যে দাবী করা যাইতেছে, তাহার গৌণ কারণগুলি সংক্ষেপে সরল ভাষায় এই ভাবে বলা যায়।—"বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতি গৌণ ব্যাপারসম্বন্ধে এবং যে সকল বিষয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজের স্বার্থসংপৃক্ত সেই সকল ব্যাপারে সুফলপ্রসূ হইলেও, মুখ্য [redacted], অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহার উপরে দেশের লোকের জীবন-যাত্রার উপচয় ও সুখ নির্ভর করিতেছে, সে সমুদয় ব্যাপারে সফল নহে।" বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ যখন ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসেন, তখন

তাঁহারা ভাবিয়া আসেন যে একটা অর্দ্ধসভ্য দেশ ও জাতি দেখিব; পরন্তু তাঁহারা যখন ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রেলপথ, রাজপথ প্রভৃতি শাসন-ভঙ্গীর বহিরঙ্গের শৃঙ্খলা এবং পদ্ধতি দেখেন—তখন তাঁহারা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যান। কিন্তু তাঁহারা যদি দেশবাসিগণের জীবনযাত্রার পদ্ধতি দেখিতেন, মাসে ২৫৲ টাকা বেতনে এই প্রকারে জীবনসংগ্রামে বিব্রত ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্য ব্যাকুল কেরাণীকুলকে দেখিতেন, দিনে একবার করিয়া খায়—এই প্রকারের শ্রমজীবিগণকে যদি দেখিতেন, যে কুটীরে তাহারা বাস করে, সেই কুটীরসমূহ যদি দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা চিন্তা করিবার হেতু পাইতেন। আর শিক্ষিত লোকেরা যদি অসঙ্কোচে তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তীব্র অসন্তোষ দেখিয়া বিস্মিতও হইতেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে গোপালকৃষ্ণ গোখলে এ সমুদয় বেশ স্পষ্ট ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন—

"এ দেশে ইংরেজশাসনের যে বিশিষ্ট অধিকার, তাহার মূলে এই নিয়ম থাকা চাই যে যেন ঐ শাসনব্যবস্থা ক্রমিক উন্নতিমুখী হয়। আমি মনে করি, প্রত্যেক চিন্তাশীল লোক—তিনি যে সমাজেরই হউন—এ কথা স্বীকার করিবেন। এখন এই শাসনব্যবস্থা উন্নতিমুখী কি না, এবং ইহা ক্রমিক উন্নতিমুখী কি না, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য আমি চারিটি প্রমাণ প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছি। প্রথম প্রমাণ, যাহা আমি প্রয়োগ করিতে চাই, তাহা এই,—সমুদয় জনশ্রেণীর নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য সরকার কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমি আধুনিক শাসন-ব্যবস্থার সেই সব উপায়গুলি ধরিব না, যাহা সরকারকে নিজের অস্তিত্বরক্ষার জন্যই প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছে—যদিচ সেগুলি আনুষঙ্গিকরূপে ও পরোক্ষভাবে জনশ্রেণীর উপকার করিয়াছে—যেমন রেলওয়ে, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ ও ঐ প্রকারের অন্যান্য

ব্যবস্থা। সর্ব্বসাধারণের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির উপায়বিধান বলিলে আমি ইহাই জানিতে চাই যে, শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকার কি করেন? প্রজাবর্গের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কি করেন? কৃষির উন্নতির জন্য কি করেন? ইত্যাদি। ইহাই আমার প্রথম প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রমাণ যাহা আমি প্রয়োগ করিতে চাই, তাহা এই—আমাদের স্থানীয় ব্যাপারের পরিচালনায় অর্থাৎ মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে আমাদের অধিকার বাড়াইয়া দেওয়া সম্বন্ধে সরকার কি করেন? তৃতীয় প্রমাণ এই,—যে লাট-পরিষদে রাজ্য-শাসনের নীতি স্থিরীকৃত হয়, সেই পরিষদে সরকার আমাদের কি অধিকার দেন? পরিশেষে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে, ভারতবাসীদিগের সরকারী কর্ম্মে উচ্চপদের অধিকারী হইবার দাবী কতটা গ্রাহ্য করা হইয়াছে?"

(খ) পদ্ধতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক—সরকারী কর্ম্মচারিগণ।

এইগুলি গোখলের নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ। এখন এই প্রমাণ-চতুষ্টয়ের কষ্টি-পাথরে গবর্মেণ্টের প্রবর্ত্তিত শাসন-পদ্ধতির সাফল্যের পরীক্ষা ভারতবাসিগণ নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মত করিতে পারেন। কিন্তু এই সমস্ত পরীক্ষার দ্বারা যে বিফলতা প্রতিপন্ন হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, এই কথাটা এখানে বলা দরকার যে, এখানে ব্যক্তিগত নিন্দা করিবার প্রয়োজন নাই, ইংরাজের পরিবর্ত্তে ভারতবাসীকে বসাইলেও হইবে না, সমগ্র পদ্ধতিটাই বদলানো আবশ্যক। দায়িত্ববিহীন শক্তি হাতে পাইলে খুব ভাল লোকও খারাপ হইয়া যায়, ইহা একটী সর্ব্বজনমান্য সিদ্ধান্ত। যেমন বার্ণার্ড হাউটন বলেন যে, "নিরঙ্কুশ শক্তির পরিচালনা অনেক উন্নততর সদ্‌গুণকেও কলুষিত করে।" সরকারী কর্ম্মচারিগণ বেশ সরল ভাবেই এই বিশ্বাসে আসিয়া উপনীত হন যে, যাহারা এই পদ্ধতি বদলাইতে চায়, তাহারা রাজ্যের ভিত্তিই দুর্ব্বল করিতে চায়। 'সরকার' বলিতে তাঁহারা

বুঝেন সরকারী কর্ম্মচারী, কাজেই তাঁহাদের সমালোচনা করিলে তাহা রাজদ্রোহ বলিয়া বিবেচিত হয়। এ প্রকারের ঘটনা ইতিহাসে সুপরিচিত —ভারতবর্ষে ইতিহাসের কেবল পুনরাবৃত্তিই হইতেছে। পূর্ব্বোল্লিখিত লেখকেরই কথা উদ্ধৃত করিতেছি। আমি আমার নিজের কথায় বলা অপেক্ষা তাঁহার কথায় বলাই বেশী সঙ্গত মনে করি—আমার যাহা মত, তিনি ঠিক তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ আমি যেমন পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইব, তিনি অবশ্য সেরূপ বিবেচিত হইবেন না। উক্ত লেখক মর্ম্মস্পর্শিণী ভাষায় নিম্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"তিনি (সরকারী কর্ম্মচারী) বহু বৎসরের অভ্যাসের ফলে কার্য্যবিবরণী-প্রেরণ, রিটার্ণ দাখিল ও অন্যান্য যন্ত্রবদ্ধ কার্য্যে বেশ সুদক্ষ হইয়াছেন। এই কাজগুলি তাঁহার মস্তিষ্কবৃত্তির টানা-পড়েন বলিলেও হয়। তাঁহার নিজস্ব কোনও ধারণা নাই, কেবল অপরের ধারণার প্রতিধ্বনি তাঁহার মস্তিষ্কে আছে। অপরীক্ষিত কোনও সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইলে তিনি তৎপ্রতি বিরক্তি ওঅরুচির ভাব প্রকাশ করেন। শাসন-যন্ত্র হাতে করিয়া সর্ব্বদা কাজ করিতে করিতে কলের যে ঝঞ্ঝাটহীন গতি ও কলের যে চাকচিক্যময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সামঞ্জস্যময় পরিচালনা, তিনি মনে করেন যে, উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা—তিনি তাঁহার এই প্রবাসক্ষেত্রের আর কি সেবা করিতে পারেন? তিনি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া বসিয়া থাকেন, যেন তাঁহার এই বিশিষ্ট যন্ত্রের চাকার দন্তগুলি বেশ উজ্জ্বল মসৃণ থাকে, এবং নিঃশব্দে কাজ করে, এবং চাকার ঘূর্ণনের ব্যতিক্রম হইতে উৎপন্ন কোনরূপ কোলাহল বা পশ্চাদাবর্ত্ত যেন একেবারেই না হয়। কাজেই কিছুদিন পরে তিনি যে আপিসের জানালার গরাদে দিয়া সমগ্র জগৎটা দেখিবেন, ইহা ~~একেবারেই~~ অস্বাভাবিক নহে। কাজেই যখন কোনও নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহাকে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হয়, তখন সেই প্রস্তাব জনসাধারণের জীবনের

পথে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা সম্মুখে রাখিয়া তিনি বিচার করিতে পারেন না। আমলা-তন্ত্রের ইহাতে কি সুবিধা অসুবিধা ঘটিবে এবং তাহাদের প্রতিপত্তিরই বা কিরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে, তাহাই সম্মুখে রাখিয়া তিনি বিচার করিতে বাধ্য হন। সেকালের মঠাধ্যক্ষের মত অথবা ইংলণ্ডের খাঁটি গ্রাম্য জমীদারের মত তাঁহার সাধারণ জনগণের প্রতি একটা অনুকম্পার ভাব থাকে বটে, এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য সাধারণভাবে মনোযোগী হইবার তাঁহার ইচ্ছা ও আগ্রহও থাকে বটে,—যদি তাহারা কোনরূপ নিজেদের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ না করে, যদি তাহারা নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য কোনরূপ চেষ্টা না করে, এবং তাঁহার ও তাঁহার আদেশের যদি কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ না করে। এই যে সর্ত্ত, ইহার মধ্যে অনেক তাৎপর্য্য আছে। নিজের সিদ্ধান্তকে একরূপ ভগবানের সিদ্ধান্তের মত বিবেচনা করায়, এবং তিনি নিজে যে আমলা তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, সেই আমলা-তন্ত্রকে একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠানরূপে বিবেচনা করায়, বাহিরের সাধারণ লোক যতক্ষণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য নীরবে ও শান্তভাবে পালন করে, রাজ্যের বড় বড় ব্যাপার লইয়া কিছু না বলে—ততক্ষণ তিনি তাহাদের প্রতি সদয় থাকেন। রাজ্যের বড় ব্যাপার সম্বন্ধে কথা কওয়া তাহাদের পক্ষে অতি ভয়ানক অপরাধ। সরকারী কর্ম্মচারিগণের কার্য্যের সুস্পষ্ট এবং অবাধ সমালোচনা তাঁহার আরও গভীর মর্ম্মস্থান স্পর্শ করে—তাহা যেন রাজ-মর্য্যাদার অপহ্নবকারী। কোনও কর্ম্মচারীই তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীর নিকট কোন সমালোচনা সহ্য করিতে পারেন না—সাধারণ লোকে ত গণ্ডীর বাহিরে অন্ধকারে অবস্থিত, তাহারা ত তাঁহাদের মতে তাহার অধস্তন কর্ম্মচারীদেরও সমকক্ষ নহে। আচ্ছা, এস্থলে যদি সাধারণ লোকে তাঁহাদের কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিয়া এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত করে যে, এই উন্নত ও উদার আমলা-তন্ত্রের পরিশ্রম

সত্ত্বেও সমস্ত শাসন-ব্যাপার এই সর্ব্বোত্তম জগতে ঠিক সর্ব্বোত্তম নহে, তখন কেমন করিয়া ধৈর্য্যের সহিত তাঁহারা তাহা শুনিবেন? আর তাহারা যদি এমন কোনও সংস্কারের কথা উপস্থাপিত করে. যাহা কখনও তাঁহার বা তাঁহার সম্প্রদায়ের মনে উদিত হয় নাই, এবং সে সংস্কারের সহিত যদি তাঁহার চিরপোষিত আদর্শের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমলা-তন্ত্রের সাধক কর্ম্মচারী যে কি করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশ শাসন করা এই আমলাগণের কাজ। শাসনের পবিত্র রহস্যে কেবল তাঁহারাই দীক্ষিত; শাসন-যন্ত্রের রহস্যময় কর্ম্মপ্রণালী কেবল তাঁহারাই বুঝেন। সাধারণ বাহিরের লোক বড় জোর বিনীতভাবে দুই একটা আবেদন জানাইতে পারে, কিন্তু তাহার বেশী নয়। যাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, বা স্বাধীনভাবে কার্য্য করে, তাহাদের মূর্খতা ও ভ্রান্তি তাহাদের দম্ভেরই তুল্য। এমন স্বাধীনচেতা প্রজার সংস্কার-চিকীর্ষা ঠিক যেন কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র তাহাদের শিক্ষকের নিকট চিরপ্রচলিত ব্যবস্থাপত্রের পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেছে, অথবা পাঠ্যপুস্তকের তালিকা বদলাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। এই সকল কর্ম্মচারিগণ মানবোচিত স্বাধীনতাকে রাজদ্রোহিতা বলিয়া মনে করেন; তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের শাসিত দেশে দুই রকম লোক থাকিতে পারে,—এক বিদ্রোহী আর এক নিরীহ মেষ; তাঁহারা ইহা ভিন্ন অন্যরূপ কল্পনা করিতে পারেন না।"

(গ) বেসরকারী ইঙ্গ ভারতপ্রবাসী।

এই সকল উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ যে জাতীয় লোক, সংখ্যায় অল্প কিন্তু শক্তিশালী সেই জাতীয় আর একদল লোক ভারতবর্ষে বাস করায় সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ প্রবাসী লোকের সংখ্যা এদেশে ১২২৯১৯; আর ব্রিটিশভারতের লোকসংখ্যা

২৫ কোটী ৫০ লক্ষ, আর অল্পবিস্তর পরিমাণে ব্রিটিশ প্রভাবে প্রভাবিত দেশীয় রাজ্যের লোকসংখ্যা ৭ কোটী। সাধারণতঃ এই বেসরকারী দল রাজনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না, তাঁহারা অন্য কার্য্যে ব্যস্ত; কিন্তু জাতির পক্ষে সত্যসত্য কল্যাণকর কোনও সংস্কারের কোনও আশা যখন ভারতবাসিগণের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, সেই সময়ে তাঁহারা রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এ বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিল এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"শাসক জাতির যে সমুদয় লোক অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে যায়, তাহাদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল শাসনে সংযত রাখা প্রয়োজন। তাহারা রাজ্যশাসনের প্রধান অন্তরায়সমূহের মধ্যে অন্যতম। রাজার জাতির প্রভাবও প্রতিপত্তিতে সু-সজ্জিত হইয়া, বিজেতৃ-জাতিসুলভ উপেক্ষাপূর্ণ দম্ভের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ করিয়া, তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বি-শূন্য শক্তির দ্বারা যে সমুদয় হৃদয়ভাব উদ্দীপিত হয়, সেই সমুদয় ভাবই অহরহঃ পোষণ করে, কিন্তু তাহাদের কোনরূপ দায়িত্ববুদ্ধি থাকে না।" এই ভাবে সার জন লরেন্স লিখিয়াছিলেন,—

"এই সমস্ত ব্যাপারে ন্যায়মত কার্য্য করিবার পক্ষে বাধা ভারতসরকারের সম্মুখে অত্যধিক। দেশের লোকদের সাহায্য করিবার জন্য যদি কিছু করা হয়, বা করিবার সংকল্প করা হয়, তাহা হইলে চারিদিকে একটা অসন্তোষের গর্জ্জন উপস্থিত হয়; সেই গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি ইংলণ্ডে যাইয়া পঁহুছে এবং সেখানে সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। আমি সময়ে সময়ে কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি। ভাবের রাজ্যে মুখের কথায় সকলেই ন্যায়পরতা, মিতব্যবহার প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর পক্ষপাতী, কিন্তু এই সকল বিধানকে এমন ভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে যাওয়া যায় যে, তাহাতে কাহারও স্বার্থে আঘাত লাগে, তখনই তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।"

সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সমানভাবে ব্যবহার করার বিধান সম্বন্ধে কীন বলেন—

"কিন্তু ভারতবর্ষে এই নীতির প্রয়োগ করিতে গেলেই, যে অল্পসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিবাদ জাগিয়া উঠে। এই শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়, এমন কি, শাসনব্যবস্থার সহিত তাহাদের কোনও যোগ না থাকিলেও, সম্প্রদায় হিসাবে তাহারা যে উচ্চ, এইরূপ দাবী করে। অবশ্য ইহা অনেকটা স্বাভাবিক যে, যে দেশে জাতি-ভেদপ্রথা প্রবল—সে দেশে শাসক-সম্প্রদায়ের স্বজাতীয়গণ, লর্ড লিটনের ভাষায় এক প্রকার শ্বেতাঙ্গ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িবে; এবং ইহাও নিশ্চিত যে, কার্য্যতঃ জাতিগত গর্ব্ব ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অধিকার তাহাদের মধ্যে 'আমরা উচ্চ' এই প্রকারের একটা ভাব জাগাইয়া দিবে। এই ভাবটি যখনই আত্মপ্রকাশ করে, বিশেষতঃ উচ্চকর্ম্মচারী হওয়ার যে দায়িত্ব, যদি উহা সেই দায়িত্বসুলভ কমনীয়তা বর্জ্জিত হয়, সে সময় ইহা বড়ই অশোভন, এমন কি, বিপজ্জনক হইয়া উঠে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের সময় এই ভাবটা নিতান্ত দুর্ব্বল ছিল না। সে সময়ে, যে দলের কথা বলা হইল, সে দলের লোকসংখ্যা খুব বেশী ছিল না। আর তাহাদের তেমন প্রতিপত্তিও ছিল না। কিন্তু এখন ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী, এবং কলিকাতার ও লণ্ডনের খবরের কাগজগুলির সহিত সম্বন্ধ থাকায় ইহারা ইহাদের হৃদয়ের জ্বালা অপরকে অবাধে শুনাইতে পারে।"

লর্ড রিপণের সহানুভূতিপূর্ণ শাসনের সময় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। আজ আবার সেই প্রকারের ঘটনা উপস্থিত। আমরা দেখিতেছি, মান্দ্রাজের মান্দ্রাজ মেল, কলিকাতার ইংলিশম্যান, প্রয়াগের পায়োনীয়র, ও লাহোরের সিভিল-মিলিটারী গেজেট,

এবং লণ্ডনের টোরী ও ইউনিয়নিষ্ট সংবাদপত্রের সহযোগিগণের নেতৃত্বে, এবং যে সকল সরকারী ও বেসরকারী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অবসর লইয়া ইংলণ্ডে বাস করিয়াছেন তাঁহাদের সাহায্যে ইউরোপীয় সভাগুলি অধুনা-প্রস্তাবিত সংস্কার-সম্বন্ধে প্রাণপণে বাধা দিতেছে। আমরা জানি যে ইংলণ্ডের অধিবাসীবৃন্দের চিত্তের উপর ক্রিয়া করিতে না পারিলেও, এই প্রতিবন্ধকতা, স্বাধীনতার জন্য এদেশে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহার এক বিষম বিঘ্ন। ইংলণ্ডে যে এই চেষ্টা বিফল হইতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এ দেশে রাজার আদেশে সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলেও তাহারা তাহার প্রভাব হ্রাস করিবার চেষ্টা করিবে, এবং তাহা যাহাতে বিফল হয়, তাহারও চেষ্টা করিবে। এই প্রকারে মিণ্টো-মর্লে-সংস্কারের উপযোগিতা নষ্ট হইয়াছে, এবং এখন হইতে খুব সতর্ক না হইলে জাতীয়-মহাসমিতি ও মুসলমান-সমিতির প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া যখন আইন রচিত হইবে, তখনও তাহার অবস্থা ঐরূপই হইবে।

(ঘ) ইংলণ্ডের উপর প্রতিক্রিয়া।

এই যে ইংরাজরুচি ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ভারতবর্ষীয় শাসনপদ্ধতি, ইহা খাস ইংলণ্ডের যে কি ভয়ানক ক্ষতি করিতেছে, ,তাহার বিচার না করিয়া পারা যায় না। মিষ্টার হবসন দেখাইয়াছেন,—

"যেমন আমাদের স্বাধীন স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত উপনিবেশগুলি আমা-দিগকে একটা আশা ও উৎসাহ দান করিয়াছে, এবং স্বায়ত্তশাসন-কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করায় তাহার ফলে স্বাধীনতা এবং সাম্যের ভাব, যেন সমীরসম্পীড়িত সুগন্ধের মত গ্রেট-ব্রিটেনের জনশ্রেণীর মধ্যে একটা স্বাতন্ত্রের সাধ জাগাইয়া দিয়াছে, সেইরূপ স্বেচ্ছাতন্ত্রে শাসিত আমাদের অধীন দেশসকলে কর্ত্তৃত্ব করার ফলে আমাদের দেশের লোকের

চরিত্র একবারে নষ্ট করিয়া দিতেছে। তাহাদের মধ্যে পদস্থজনগণের আনুগত্য এবং ইতরযোগ্য মোসাহেবী, ধন ও উচ্চপদবীর প্রতি অত্যধিক প্রশংসার ভাব ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে। এই ভাবগুলি মধ্যযুগের অভিজাত-তন্ত্রের বৈষম্যের কলুষিত নিদর্শনের ন্যায় হেয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কবডেন আমাদের ভারত সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বেশ জোরের সহিত এই প্রশ্ন উপস্থিত করেন। 'যেমন গ্রীস ও রোম এসিয়ার সহিত সংস্পর্শে আসিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাচ্যদেশে স্বেচ্ছাশাসন-তন্ত্রের যে সমস্ত রাজনীতিক বিধানের প্রবর্ত্তন করা যাইতেছে, সেইগুলি আমাদের দেশের শাসন-ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিয়া আমাদিগকেও কলুষিত করিতে পারে। ইহা কি খুব সম্ভবপর নহে?' এই প্রতিক্রিয়া কেবল সম্ভব নহে, অবশ্যম্ভাবী। আমাদের অধিকৃত সাম্রাজ্যে স্বেচ্ছাশাসন-তন্ত্র যে পরিমাণে বাড়িতেছে, সেই পরিমাণে আমাদের দেশে বহুসংখ্যক লোক আমাদের খাসদখলের উপনিবেশে ও ভারতসাম্রাজ্যে সৈনিক ও শাসনবিভাগে কর্ম্মচারীর কাজ করিয়া স্বেচ্ছাচারের পদ্ধতি ও তদুপযোগী হৃদয়বৃত্তিতে অভ্যস্ত হইতেছে; ব্যবসায়ী, নীলকর, চা-কর পূর্ত্তবিভাগের বড় ও ছোট কর্ম্মচারী প্রভৃতির দ্বারা ইহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইতেছে। ইহারা সাধারণ ইউরোপীয় সমাজের সমুদয় শাসন-সংযমের বাহিরে থাকিয়া এক উদ্ভট জাতির মত কৃত্রিম জীবন যাপন করিয়া যে চরিত্র, চিন্তা ও ভাব সেই বৈদেশিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহাই লইয়া দেশে ফিরিয়া আসে।"

যাঁহারা সিভিল-সারভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শাসক হইয়া এদেশে আসেন তাঁহারা এদেশের ভাষা-ভাব অপরিজ্ঞাত থাকায় বিদেশী বলিয়া পরিচিত হন এবং বিদেশীই থাকিয়া যান। পরে ঐ

সিভিলিয়ানগণ যখন তাঁহাদের স্থিতিকাল পূর্ণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান তখন তাঁহারা নিজের দেশেও বিদেশী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কারণ সিভিলিয়ানের কার্য্যকালে তাঁহারা যে দুষ্ট ভাব ও পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হন তাহার ফলে তাঁহারা তাঁহাদের জাতিগত চরিত্র ও প্রকৃতি একেবারেই হারাইয়া ফেলেন। নবীন সিভিলিয়ানরূপে যে কাঁচা মাল আমরা ভারতবর্ষে আমদানী করি তাহার দ্বারা আমরা ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর বিশেষ কোন সুবিধা ঘটাইতে পারি না, পরন্তু এইসকল অপরিণত সিভিলিয়ান যখন পরিণত হইয়া তৈয়ারী মালরূপে স্বদেশে ফিরিয়া যান তখন তাহাদের স্বেচ্ছাশাসন তন্ত্র-জাত শিক্ষা ও দীক্ষার প্রভাবে প্রকৃতি এতই বিগড়াইয়া যায় যে, তদ্দ্বারা গ্রেটব্রিটনের কোন লাভ হয় না। ফলে, এই সিভিলিয়ান আমদানী ও রপ্তানীর প্রভাবে কি ভারতবর্ষ কি ইংলণ্ড কোন পক্ষেরই কল্যাণ হইতেছে না।

(৬) প্রথম প্রমাণের প্রয়োগ।

এখন গোখলের নির্দ্দিষ্ট প্রথম প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখা যাউক, এই আমলাতন্ত্র শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষির উন্নতির জন্য কি করিয়াছে? আমি তথ্যগুলি খুব সংক্ষেপে উপস্থাপিত করিব; কিন্তু এই তথ্যগুলি অবিসংবাদিত।

শিক্ষা—যে সমস্ত বালকবালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহাদের হার সমুদয় লোকসংখ্যার তুলনায় শতকরা ২.৮ মাত্র। গোখলে মহোদয় ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার পর এই হার শতকরা ০.৯ বাড়িয়াছে। কিন্তু এই যে শতকরা হার, ইহাও ভ্রমোৎপাদক। শিক্ষাবিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে

যে, বালকবালিকাগণকে চারিবৎসরের কম সময় পড়াইলে তাহারা ঐ সময়ে যাহা শিক্ষা করে তাহা ভুলিয়া যায়। ১৯১৪—১৫ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক তালিকা দৃষ্টে আমরা দেখিতে পাই যে, ইংরেজশাসিত ভারতে ৬,৩৩৩,৬৬৮ জন বালক ও ১,১২৮,৩৬৩ জন বালিকা একুনে ৭,৪৬২,০৩১ বালক-বালিকা শিক্ষাধীন ছিল। ইহার মধ্যে ৫,৪৩৪,৫৭৬ জন নিম্ন প্রাথমিক পর্য্যন্তও পড়ে নাই। তাহার মধ্যে আবার ১,৬৮০,৫৬১ জন পড়িতেই শেখে নাই। সমগ্র সংখ্যা হইতে যদি এই সংখ্যাটিকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কেবল ২,০২৭,৪৫৫ জন মাত্র বালকবালিকা এমন শিক্ষা পাইতেছে, যাহা তাহাদের কাজে আসিবে—ইহাতে শতকরা হিসাবে মাত্র ৮৩ দাঁড়ায়। কি ভয়ঙ্কর কথা! ৫৫ লক্ষ বালকবালিকার বিদ্যালাভের জন্য যে টাকাটা খরচ করা হয়, তাহা বঙ্গোপসাগরের জলে ফেলিয়া দিলেও চলে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষে, যে সমস্ত বালকবালিকার বিদ্যালয়ে যাইবার বয়স, তাহাদের মধ্যে শতকরা ২০·৪ অংশ মাত্র বিদ্যালয়ে যাইত।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্মেণ্টের হিসাবে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ছিল। সার চার্লস উড ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যে শিক্ষা-বিষয়ক নিদেশপত্র প্রচার করেন, তাহার দ্বারা শিক্ষাবিভাগ গঠিত হয়। শিক্ষাবিভাগ গঠনের ৫৯ বৎসর পরে এই ফল ফলিয়াছে! ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে শিক্ষা-আইন প্রবর্ত্তিত হয়। সে সময়ে ইংলণ্ডে শিক্ষার অবস্থা আমাদের অবস্থার অনেকটা অনুরূপ ছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রধানতঃ ধর্ম্মযাজকগণের অধীন বিদ্যালয়সমূহে নিয়মিত সাহায্যদান আরব্ধ হইয়াছিল। ১৮৭০ হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়; এবং ঐ বার বৎসরের মধ্যে ৪৩·৩ হইতে শতকরা প্রায় ১০০ জন ছাত্রের সংখ্যা হইয়াছিল। এখন ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা চার কোটী, আর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬০ লক্ষ।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, জাপানে, যে সকল বালকবালিকার বিদ্যালয়ে যাইবার বয়স ছিল, তাহাদের মধ্যে শতকরা ২৮ জন অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান হার অপেক্ষা শতকরা ৮ জন বেশী বিদ্যালয়ে যাইত। ২৪ বৎসর পরে এই হার ৯২য়ে পরিণত হয়। ২৮ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক অর্থাৎ সর্ব্বজনীন হইয়াছে। বরোদায়ও শিক্ষা অবৈতনিক, এবং অনেকটা বাধ্যতামূলক; সেখানেও শিক্ষা সর্ব্বজনীন। ত্রিবাঙ্কুরে শিক্ষোপযোগী বয়সের বালকগণের শতকরা ৮১.১ ও বালিকাগণের শতকরা ৩৩.২ জন বিদ্যাশিক্ষা করে। মহাশূরে শিক্ষার্থী বালকের হার ৪৫.৮ এবং বালিকার হার ৯.৭। বরোদা-রাজ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ছয় আনা ছয় পাই ব্যয় হয়! ইংরাজ-শাসিত ভারত তিন আনা মাত্র ব্যয় করে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিক্ষার ব্যয় ৫৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। ভূমি-কর আট কোটী টাকা বাড়িয়াছে। সামরিক বিভাগের ব্যয় তের কোটী বাড়িয়াছে। দেওয়ানী ব্যয় আট কোটী বাড়িয়াছে। রেলনির্ম্মাণে মূলধন প্রয়োগ ১৫ কোটী বাড়িয়াছে। (আমি গোখলের প্রদর্শিত সংখ্যা উদ্ধার করিতেছি।) গোখলে হিসাব দেখাইয়া বিদ্রূপের সহিত বলিয়াছিলেন যে, দেশের লোকসংখ্যা যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে এই হারে আর এক শত পনের বৎসরে প্রত্যেক বালক এবং ৬১৫ বৎসর পরে প্রত্যেক বালিকা বিদ্যালয়ে যাইবে। প্রতিনিধি-ভ্রাতৃগণ! আমরা আশা করি, হোমরুলের অধীনে আমরা ইহা অপেক্ষা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইব। অতএব আমি বলিতে চাই যে, শিক্ষাদান-ব্যাপারে আমলাতন্ত্র অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্য ও রোগচর্য্যা—প্লেগ, কলেরা, এবং সর্ব্বোপরি ম্যালেরিয়ার প্রকোপবৃদ্ধি হইতেই, কি গ্রামে কি নগরে, স্বাস্থ্যরক্ষার অভাব প্রতিপন্ন হইতেছে। যে সমস্ত কারণে ভারতবর্ষের লোকের গড়ে

পরমায়ু এত কম, অর্থাৎ ২৩·৫ বৎসর, এই স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার অভাব তাহার অন্যতম। ইংলণ্ডে নরনারীর গড়ে পরমায়ু ৪০ বৎসর। নিউজিলণ্ডে ৬০ বৎসর। সকল ব্যাধির চিকিৎসা-বিধানের প্রধান অন্তরায় এই যে, পল্লী অঞ্চলেও বৈদেশিক চিকিৎসা-পদ্ধতিই বিশেষরূপে উৎসাহ পায়, দেশীয় পদ্ধতি কোনরূপ সাহায্য পায় না। সরকারী হাঁসপাতাল, সরকারী ঔষধালয়, সরকারী চিকিৎসক, সমস্তই বৈদেশিক পদ্ধতির। আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী ঔষধ, হাঁসপাতাল, ঔষধালয় ও চিকিৎসকগণ সরকারের নিকট অপরিচিত এবং সরকারী উৎসাহে বঞ্চিত এবং ডাক্তারের পক্ষে বৈদ্যসংসর্গ অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ত্রিবাঙ্কুররাজ্য ৭২টী বৈদ্যশালায় নিয়মিত অর্থসাহায্য করেন। এই সমুদয় বৈদ্যশালায় ১৯১৪—১৫ খৃষ্টাব্দে ১৪৩৫০৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। এই সংখ্যা এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত রোগীর অপেক্ষা ২২০০০ অধিক, (১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কার্য্যবিবরণী হইতে উদ্ধৃত)। আমাদের সরকার দেশবাসিগণের ঔষধের প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারেন না; অথচ দেশের লোকেরা যে চিকিৎসা-পদ্ধতি পছন্দ করে, তাহারা যে নিজের দেশের টাকা সেই পদ্ধতির জন্য ব্যয় করিবে, সরকার তাহাও করিতে দিবেন না। 'হোমরুল'এর অধীনে দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় পদ্ধতিই অপক্ষপাতে সমানভাবে সুরক্ষিত হইবে। আমি স্বীকার করি, এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ অভাব পূরণ করিবার জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করেন, এবং চিকিৎসাকার্য্যে প্রভূত আত্মোৎসর্গও করিয়া থাকেন। কিন্তু অভাব এত অধিক, এবং তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, আমাদের আমলাতন্ত্র শাসন-পদ্ধতি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সফলতা লাভ অসম্ভব। দেশীয় পদ্ধতি-বর্জ্জনের ফলেই এই দৌর্ষ ঘটিয়াছে। এই পদ্ধতি-বর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা একবার কৃপাপূর্ব্বক উহার উপযোগিতার পরীক্ষা করিয়াও দেখেন নাই। ইহা হইতে প্রতি-

পন্ন হইতেছে, যে, স্বাস্থ্যরক্ষায় ও রোগীচর্য্যায়ও আমলাতন্ত্র কার্য্যকর নহে।

কৃষির উন্নতি—১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারিতে দেখা যায়, কৃষিজীবী লোকের সংখ্যা ২১ কোটী ৮৩ লক্ষ। ইহাদের ভীষণ দারিদ্র্য সর্ব্বসাধারণের সুপরিচিত। ইহাদের ঋণ-ভার ক্রমাগত কিরূপ বাড়িয়া যাইতেছে, গত ত্রিশ বৎসরকাল সার্ দীনশা-ই-ওয়াচা তাঁহার আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি ইহাদের ঋণ-ভার যেমন বাড়িতেছে, করও তেমনি বাড়িতেছে। ভূমির কর ২৫ বৎসরে ৮ কোটী টাকা বাড়িয়াছে, তাহা এইমাত্র বলিয়াছি। ইহার উপর স্থানীয় কর আছে। লবণ-শুল্ক প্রভৃতি আছে। লবণ-শুল্ক নিতান্ত দরিদ্র লোককেই উৎপীড়িত করে। তথাপি গত আয়-ব্যয়-নির্দ্দেশের সময় এই লবণশুল্ক ৯০ লক্ষ টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দারিদ্র্যের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কৃষকের শরীরের উপযুক্ত পুষ্টি হয় না বলিয়া তাহাদের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। পরমায়ু কমিয়া যাইতেছে। শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা ভয়ঙ্কর বাড়িয়া যাইতেছে। গোপালকৃষ্ণ গোখলে 'দুষ্টবুদ্ধি' আন্দোলনকারী ছিলেন না। এ বিষয়ের আলোচনায় যে সমুদয় অঙ্ক প্রায়ই উদ্ধৃত হয়, ১৯০৫ খৃঃ অব্দে তিনি তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"সার্ উইলিয়ম হাণ্টার এক জন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার কথা প্রামাণিক। তাঁহার মতে ভারতের চারি কোটী লোক চিরজীবন দিনান্তে এক বেলা মাত্র খাইতে পায়। সার চার্লস ইলিয়ট আর এক জন প্রামাণিক ব্যক্তি। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে সাত কোটী লোক উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়া যে কি প্রকার, সম্বৎসরের মধ্যে এক দিনের জন্যও তাহা জানিবার অবকাশ পায় না। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের দারিদ্র্য

সত্যই হৃৎকম্প উৎপাদন করে। তোমরা এক শত বৎসর রাজ্যশাসন করিবার পর দেশের অবস্থা যদি এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা কিছুতেই বলিতে পার না যে, ভারতবাসিগণের যাহাতে হিতসাধন হয়, তাহাই তোমাদের শাসনের প্রধান লক্ষ্য।"

কখনও কখনও এইরূপ উত্তর শোনা হয়—"ঐ একই কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বার-বার বল কেন? আমরা ত' উহা জানি।" আমাদের উত্তর এই যে, এই একই কথা বার-বার জনশ্রেণীর জঠরে আঘাত করিতেছে, এবং এইরূপ অবস্থা যত দিন চলিবে, ততদিন আমরা এই অবস্থার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারি না। গোখলে জোরের সহিত আরও দেখাইয়াছেন—এই শোচনীয় অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। কৃষিজীবিগণের মধ্যে অল্প খাদ্যনিবন্ধন যে পুষ্টির অভাব, তাহার কোনও অঙ্ক পাওয়া যায় না—কিন্তু মান্দ্রাজ নগরে গ্রাম্য কৃষকের অনুরূপ দরিদ্র নাগরিক ছাত্রদিগের মধ্যে পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, শতকরা ৭৮ জন লোক পুষ্টিহীনতায় কষ্ট পাইতেছে। দেহযষ্টির ক্ষীণতা, বাহু ও পদের কৃশতা, জীবন-শক্তির শোচনীয় দুর্ব্বলতা—এ সকল, যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি দেখিলেই বুঝিতে পারেন। যখন চারি দিকে এইরূপ অবস্থা চলিতেছে, তখন কল্পনাহীন জড় ভিন্ন কোন্ মানুষ দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারে।

কৃষকগণের অভিযোগের শেষ নাই, এবং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া জাতীয় মহাসমিতি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রামের লোকের সুবিধা অসুবিধা যাহারা আদৌ বোঝে না, তাহারাই বনবিভাগের আইন প্রণয়ন করিয়াছে। এই আইনের ফলে গ্রামবাসিগণের কষ্টের সীমা নাই। অতি অল্পমাত্র স্থানেই বন-বিভাগীয় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে অল্পসংখ্যক স্থানে হইয়াছে, সেই সমুদয় স্থানে ফল খুব ভাল

হইয়াছে। কয়েকটি স্থানে ফল এত ভাল হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। গৃহপালিত পশুগণের জন্য চারণভূমির অভাব, নিঃশেষিতশক্তি জমির জন্য কাঁচা-সারের অভাব, বনের চারি দিকে বেড়ার অভাব—কৃষকের কতই অভাব। ঐ বেড়ার অভাবে গৃহপালিত পশুগুলি চরিতে চরিতে সেই বনের মধ্যে যায়, এবং খোঁয়াড়ে তাহাদের আটক করিয়া ছাড়িয়া দিবার জন্য মালিকের নিকট খেসারতের খরচ আদায় করা হয়, জরিমানা করা হয়, অন্যরূপ শাস্তি দেওয়া হয়, কিন্তু কি অপরাধে এই জরিমানা ও শাস্তি, লোকে তাহা ভাল করিয়া বোঝে না। জ্বালানীর জন্য, যন্ত্রের হাতলের জন্য, ঘর মেরামতের জন্য কাঠ পাওয়া যায় না; জল যাহা পাওয়া যায়, তাহা সমানভাবে বিতরিত হয় না; এই সমুদয় অসুবিধা গ্রামে ও স্থানীয় সভা-সমিতিতে আলোচিত ও বিচারিত হইয়াছে। অস্ত্র-আইন অত্যন্ত কষ্টকর; তাহার ফলে বন্য পশু ও দুর্দ্দান্ত মানবের আক্রমণ হইতে তাহারা একেবারে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। বিচার ও শাসনবিভাগের কার্য্য সংযুক্ত থাকায় সুবিচার অনেক সময়েই দুষ্প্রাপ্য এবং তাহাতে টাকা খরচও খুব বেশী, সময়ও খুব বেশী নষ্ট হয়। গ্রামের কর্ম্মচারিগণ স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই চেষ্টা করে কিসে তহশীলদার ও কালেক্টর তুষ্ট হইবে; গ্রামবাসিগণ কিসে সুখী হইবে, সেদিকে মনোযোগ দেয় না, কারণ গ্রামবাসিগণের নিকট কোন বিষয়েই তাহাদের দায়িত্ব নাই। দলাদলি সকল সময়েই প্রবল, কারণ সকল সময়েই একটা তৃতীয়পক্ষ থাকে। তাহারাই মীমাংসা-কর্ত্তা। যিনি এই তৃতীয়পক্ষ তিনি যদি উচ্চপদস্থ হন, তাহা হইলে তোষামোদের দ্বারা এবং নিম্নপদস্থ হইলে উৎকোচের দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করা যায়—এবং উচ্চই হউক আর নিম্নই হউক তোষামোদ করিলে, পদানত হইয়া থাকিলে এবং অন্যের নামে সর্ব্বদা লাগান্ ভাঙ্গান্ করিলে তাঁহাকে তুষ্ট করা

যায়। সুতরাং ভারতবর্ষে কৃষির অবস্থা ও কৃষিজীবিগণের দারিদ্র্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এ ক্ষেত্রেও আমলাতন্ত্র-শাসন কার্য্যকর হয় নাই।

গোখলের প্রথম প্রমাণ যদি ভারতের হস্তশিল্প সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া দেখা যায়, দুর্ব্বল শিল্পগুলিকে কতদূর সবল করা হইয়াছে, নূতন শিল্পের কতদূর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যাতায়াতের জন্য নদী ও খালগুলি কিরূপে রক্ষিত হইতেছে, তটবাহী বাণিজ্যের কিরূপ ব্যবস্থা হইতেছে, নীল ও অন্যান্য দেশীয় রংএর কারবার জার্ম্মাণির রাসায়নিক রংএর প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে কিরূপ রক্ষিত হইতেছে, তবে এ সমস্তের আলোচনাতেও ঐ একই উত্তর পাওয়া যাইবে। দেশের ক্ষেত্র ও খনিজাত সম্পদের কি প্রকারে পুষ্টি হইবে, সে বিষয়ে আমলা-তন্ত্রের উদাসীনতার জন্য আমাদের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে; জার্ম্মাণ জাতি এই সমস্ত সম্পদের কতকগুলি দখল করিয়া বসিয়াছে, সেদিকে দৃষ্টি ও মনোযোগ নাই, এবং এখনও জাপানীরা তাহাদের রাজশক্তির সাহায্যে জার্ম্মাণী যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, ঠিক সেই পন্থা অবলম্বন করিতেছে; কিন্তু এই আমলা-তন্ত্রের তাহাতে কোনরূপ দৃষ্টি নাই। ফলে জার্ম্মাণীর পরিবর্ত্তে এখন জাপান ভারতবাসিগণের স্বাভাবিক ও পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত অধিকার কাড়িয়া লইতেছে।

সমুদয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশে কৃষির সঙ্গে-সঙ্গে শিল্পের উন্নতি হয় এবং স্বভাবতই তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। আয়র্লণ্ডের ভীষণ দারিদ্র্য, এবং তাহার অর্দ্ধেকেরও অধিক অধিবাসিগণের দেশত্যাগ, গ্রেট-ব্রিটেন কর্ত্তৃক তাহাদের পশমের শিল্প নষ্ট করিয়া একমাত্র কৃষির উপর তাহাদিগকে নির্ভর করিতে বাধ্য করার প্রত্যক্ষ-ফল। সেই একই প্রকারের কারণ হইতে এখানেও সেই একই প্রকারের কার্য্য ঘটিয়াছে—কিন্তু এখানে যাহা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ আয়র্লণ্ড

অপেক্ষা অনেক বেশী। এখানে আর এক সমস্যাময় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা নূতন। ১৮৯১ ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির বিবরণ তুলনা করিয়া ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "ভারতবর্ষে ভূমিশূন্য একদল লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা অর্থনীতিক হিসাবে বিপজ্জনক"। "সাধারণ কৃষকগণ বৎসরের মধ্যে কেবল চাষের সময় জমিতে মজুরী করে। যখন জমির কাজ থাকে না তখন তাহারা সাময়িক কাজের চেষ্টায় বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে আসিয়া পড়ে।" আয়র্লণ্ডের মজুরদের ইংলণ্ডে আসার কথা ইহা হইতে ঠিক মনে পড়িয়া যায়। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রাচীন সময়ে গ্রামসমূহের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন ;—

"গ্রামগুলি এখনও নিজের অভাব প্রায় নিজেই পূর্ণ করে এবং প্রত্যেকেই অর্থনীতিক হিসাবে স্ব-তন্ত্র। গ্রামের লোকসমূহের আহারের জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন, গ্রামের কৃষকই তাহা উৎপাদন করে। কর্ম্মকার কৃষকের জন্য লাঙ্গলের ফাল ও গ্রামস্থ লোকের গৃহস্থালীর জন্য তাহাদের প্রয়োজনীয় লৌহপাত্রসমূহ প্রস্তুত করে। সে গ্রামের লোকের এ সকল সামগ্রী সরবরাহ করে ; কিন্তু বিনিময়ে টাকা লয় না। গ্রামের লোকেরা তাহাদের নিজের নিজের শ্রম ও উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা তাহার অভাব পূরণ করে। কুম্ভকার মাটির জিনিষ জোগায়, তন্তুবায় কাপড় দেয়, তৈলকার তৈল দেয়। কৃষকের নিকট হইতে এই সমুদয় শিল্পিগণ আপন আপন চিরকালের পাওনা ফসলের অংশ পাইয়া থাকে। এই প্রকারে আদানপ্রদানের সমস্ত কাজকর্ম্ম মুদ্রা ব্যবহার না করিয়াও চলিয়া যায়। গ্রামের লোকের পক্ষে মুদ্রা জিনিষটা কেবল সঞ্চয় করিবার মত মূল্যবান্ পদার্থ, বিনিময়ের উপকরণ নহে। যখন তাহারা

ধনী হইয়া পড়ে তখন তাহারা উহা সঞ্চয় করে—হয় মুদ্রাই সঞ্চয় করে, নয়ত সোণারূপার গহনা গড়াইয়া তাহা সঞ্চয় করে।”

দারিদ্র্যের তাড়নায় গ্রামবাসিগণ সহরে চলিয়া আসিতে বাধ্য হওয়ায় এই সমুদয় অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। গ্রামবাসিগণ সহরে আসিয়া গ্রামের সহ-যোগিতা অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার পরিবর্ত্তে প্রতিযোগিতা শিক্ষা করিতেছে। তাহাদের হৃদয়ভাব বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, বিশ্বাসের ভাব দূর হইয়া সন্দেহের ভাব জাগিতেছে। সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই সমুদয় গ্রামের সহিত দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহের তুলনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। আর্থিক ও নৈতিক সর্ব্বনাশের গতিরোধ করিতে হইলে আবার সেই স্বাস্থ্যকর ও আনন্দকর পল্লীজীবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে শাসনের মূল উপাদানরূপে পঞ্চায়ত-প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সে সম্বন্ধে আমি পরে আরও আলো-চনা করিতেছি। তদ্দ্বারা গ্রামের শিল্পসমূহের উন্নতি হইবে এবং যৌথ-সমিতির দ্বারা পরস্পরের সহিত আদানপ্রদানের সম্বন্ধসূত্র রচিত হইবে। শ্রীযুক্ত সি, পী, রামস্বামী আয়ার “যৌথ-সমিতি ও পঞ্চায়েত” নামক তাঁহার ক্ষুদ্র গ্রন্থে বলেন—

“এই যে অমঙ্গল (গ্রাম ছাড়িয়া সহরে যাওয়া), ইহা নিবারণ করার এবং গ্রামবাসিগণের নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা উন্নত করার একমাত্র উপায় যৌথ-সমিতিসমূহের ভিত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া বেশ ভালরকমের পঞ্চায়ত-প্রথা প্রবর্ত্তন। তাহা হইলেই পল্লীস্থ শিল্পসমূহের আবার উন্নতি হইবে, এবং সজীব ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজশক্তিরও পুনরায় উদ্ভব হইবে। ভারতের গ্রামগুলি যখন আবার ঠিকমত পুনর্গঠিত হইবে, তখন সুবিন্যস্ত ও সহযোগিত্বময় শিল্পসাধনব্যবস্থার এক অতি সুন্দর ভিত্তি নির্ম্মিত হইবে।”

তিনি পুনশ্চ বলেন—

"পঞ্চায়ত-প্রথার প্রবর্ত্তনের সহিত, সাধারণতঃ বিবেচিত হয় না এ প্রকারের আরও অনেকগুলি কথা আছে, গ্রাম্যজীবনের পদ্ধতির পুনরুত্থানের সহিত সেগুলি বিজড়িত। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় কথা—দেশের ছোট ছোট শিল্পের পুনরুত্থান। কি ইউরোপে, কি ভারতবর্ষে, ছোট ছোট কৃষিকেন্দ্রের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট হস্তশিল্পগুলিও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের মত দেশসমূহে কৃষি, বহুলপরিমাণে গ্রামের শিল্পসমূহকে সাহায্য করিয়াছে—এবং যে কৃষকদের অল্প জমি আছে, তাহারা জীবিকার্জ্জনের একটি অতিরিক্ত উপায়রূপে শিল্পকর্ম্মে মনোযোগী হইয়া থাকে। ভারতে পল্লীজীবনের ধ্বংস কেবল যে একটি রাজনীতিক সমস্যা তাহা নহে, ইহা অর্থনীতি এবং শিল্প-ব্যবস্থারও সমস্যা। ইউরোপে সভ্যতার তরঙ্গ সহর হইতে গ্রামে গিয়াছে—কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত। এ দেশে সামাজিক জীবনের কেন্দ্র গ্রামে, নগরে নহে। আমাদের শিল্প মূলতঃ কুটীরশিল্প ছিল এবং আমাদের শিল্পিগণ এখনও কুটীরে থাকিয়া কাজ করে—বাণিজ্য-জগতের সহিত তাহারা প্রায়শঃ সম্বন্ধশূন্য। সমস্ত জগৎ জুড়িয়া আজকাল একটা চেষ্টা হইতেছে যে, গ্রামের শিল্প ও শ্রমজীবীকে ভিত্তি করিয়া শ্রমের সহযোগিত্ব ও শ্রমবিভাগের ব্যবস্থায় বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। এই কারণ হইতেই শিল্পিগণের সমবায়মণ্ডলী, উদ্যাননগর প্রভৃতির উদ্ভব হইতেছে। এ সকলের মূল লক্ষ্য এই যে, সমবায়তন্ত্র ও সহযোগিতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারীর মধ্যে ধনবিভাগের যে দারুণ বৈষম্য তাহা দূরীভূত হউক। ভারতবর্ষ চিরদিনই ছোট ছোট কৃষকের দেশ এবং তাহার ফলে পাশ্চাত্যদেশে অল্প কয়েকজন লোকের

হাতে টাকা পুঞ্জীভূত হওয়ায় যে সমুদয় কুফল ফলিতেছে, ভারতবর্ষে সেই সমুদয় হয় নাই। আমাদের মধ্যে সমাজসেবার যে প্রবৃত্তি আছে, সেই প্রবৃত্তি এবং আমাদের গার্হস্থ্যজীবনের যাহা মূল শিক্ষা সেই শিক্ষা, এই উভয়ে মিলিয়া মূলধনকে এক জায়গায় জমিতে দেয় নাই। এই কারণেই ভারতবর্ষে বৃহৎ আয়তনের কলকারখানার উদ্ভব হয় নাই।”

কলকারখানার দ্বারা সহরে যে দারুণ দুঃখ ও দুর্দ্দশা হয়, তাহা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করার পর ইংলণ্ড এই সমুদয় পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সমুদয় পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরু।

ইংলণ্ডের এক সভায় বক্তৃতা উপলক্ষে জি, কে, গোখলে মহোদয় ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা এই ভাবে বর্ণনা করেন—

“হিসাব দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, তোমাদের বার্ষিক আয় গড়ে জনাপিছু ৪২ পাউণ্ড। আর আমাদের? সরকারী হিসাবে ২ পাউণ্ড আর বেসরকারী হিসাবে এক পাউণ্ড হইতে সামান্য কিছু বেশী। তোমাদের দেশে আমদানী প্রত্যেকের জন্য প্রায় তের পাউণ্ড আর আমাদের ৫ শিলিং। তোমাদের ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে মজুত আছে ১৪ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড; তাহা ছাড়া ট্রাষ্টি সেভিংস ব্যাঙ্কে তোমাদের মজুত ৫ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড। আর আমাদের দেশের লোকসংখ্যা তোমাদের লোকসংখ্যার ৭ গুণ অথচ আমাদের ডাকঘরে মজুত আছে কেবল ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ইহার প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ ইউরোপের লোকের। তোমাদের যৌথ কারবারে নিহিত মূলধন ১৯০ কোটী আর আমাদের ২ কোটী ৬০ লক্ষও নহে। আবার ঐ টাকারও অধিকাংশ ইউরোপের লোকের। আমাদের দেশের ৫ ভাগের ৪ ভাগ লোক

কৃষিজীবী আর এই কৃষি বেশ দ্রুতগতিতে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতের কৃষকগণ একেতো অত্যন্ত দরিদ্র, আবার তাহার উপর তাহারা অত্যন্ত ঋণ-ভারগ্রস্ত ; ফলে জমিতে মূলধন নিয়োগ করিতে পারে না এবং তাহার ফলে ভারতে কৃষির অধিকাংশ ফসল—যেমন সার্ জেম্স্ কেয়ার্ড প্রায় ২৫ বৎসর পুর্ব্বে দেখাইয়াছেন—ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তিকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে। এক একারে যে শস্য উৎপাদিত হয়, তাহার পরিমাণ প্রত্যহ কমিতেছে। ইংলণ্ডে এক এক একারে ৩০ বুশেল শস্য জন্মায় আর আমাদের দেশে এক এক একারে মাত্র ৮।৯ বুশেল জন্মাইয়া থাকে।"

গোখলের প্রথম প্রমাণের অধীনে যে যে বিষয় আলোচিত হইল, তাহার সমুদয় গুলিতেই আমলা-তন্ত্রের অক্ষমতা পরিদৃষ্ট হইল।

(চ) ভারতবাসিগণকে একবার সুযোগ দাও।

এ বিষয়ে আমরা যাহা বলি, তাহা এই। দেশের সর্ব্বসাধারণ জন-শ্রেণীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিসাধন করিতে তোমরা অকৃতকার্য্য হইয়াছ। জাপান ও অন্যান্য জাতি নিজের দেশের যাহা করিয়াছে, তাহা করিবার জন্য ভারতবাসিগণকে একটা সুযোগ দিবার ঠিক সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই? নিশ্চয়ই এ দাবী অন্যায্য নহে। ইঙ্গ-ভারতপ্রবাসিগণ যদি বলেন যে, দেশের সাধারণ জনশ্রেণী তাঁহাদেরই বিশেষরূপ পালনের পাত্র, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে না—শিক্ষিত সম্প্রদায় কেবল শক্তি ও পদ চায়, তাহা হইলে আমরা জাতীয় মহাসমিতির প্রতি তাহাদের লক্ষ্য করিতে বলিব এবং সেই মহাসমিতির বক্তৃতা ও নির্দ্ধারণগুলির আলোচনা করিতে বলিব। সেই সকল বক্তৃতায় ও নির্দ্ধারিত মন্তব্যে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে সাধারণ জনশ্রেণীর প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভালবাসা ও তাহাদের সম্বন্ধে শিক্ষিত

সম্প্রদায়ের জ্ঞান কত গভীর! দেশের অপ্রতিবিধেয় দারিদ্র্যের প্রতি নিশ্চেষ্ট নৈরাশ্যের সহিত তাহারা যে, চাহিয়া আছে, ইহা তাহাদের দোষ নহে। এ সম্বন্ধে বিচারপতি শ্রীযুক্ত রহিম সাহেব কি বলেন শুনুন:—

"বহু কোটী ভারতবর্ষীয় সাধারণ লোকের কল্যাণ অকল্যাণের প্রতিভূত্ব ভারতীয় সরকারী বা বেসকারী ভদ্রলোক অপেক্ষা ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারিগণ ভালরূপ করিয়া থাকেন, এরূপ অসঙ্গত দাবী যে কি প্রকারে উপস্থাপিত করা হয়, তাহা ধারণা করাই অসম্ভব। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ ভারতবর্ষের কথিত ভাষাসমূহ আয়ত্ত করিতে পারেন না, তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবন-প্রণালী ও চিন্তাপ্রণালী সাধারণ জনশ্রেণী হইতে তাঁহাদের বহু দূরে পৃথক করিয়া রাখে। সে জন্য অতিশয় অল্পসংখ্যক লোক, অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে কদাচ এই বাধা অতিক্রম করিতে কৃতকার্য্য হন। পরন্তু শিক্ষিত ভারতবাসিগণের পক্ষে এই জ্ঞান সংস্কারজ এবং এ দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি,—যাহার প্রভাব পূর্ব্বদেশে এত প্রবল, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঐ জ্ঞান ও সহানুভূতিকে খুবই সত্যোপেত করিয়াছে; জড়বাদপ্রতিষ্ঠ দেশে এ প্রকার দেখিতেও পাওয়া যায় না।"

এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শক্তিমত্তার অভাবই যে আমলা-তন্ত্রকে বিফল করিয়াছে, তাহা নহে। কারণ ইংরাজবণিক ও কলওয়ালা ভারতবর্ষে নিজেদের অসাধারণ উন্নতিসাধন করিয়াছে। তবে কথা এই যে, এই আমলা-তন্ত্র এই প্রকারের ব্যাপারে (অর্থাৎ দেশ-বাসিগণের কল্যাণ-সাধনে) ততটা মনোযোগী নহে। রুশ দেশের আমলা-তন্ত্র রুশ দেশের সাধারণ জনশ্রেণীর কিসে সুখসমৃদ্ধি হইবে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল; তাহারা কিসে বশীভূত হইয়া থাকিবে, কিসে নিয়মিতভাবে দেয় খাজনাটি দিবে, সেই দিকেই তাহাদের যত্ন

ছিল। আমলা-তন্ত্র সকল দেশেই এক প্রকার। সেই জন্যই আমরা এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে, ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধ নহি। ইংরাজ আমলাতন্ত্রের স্থলে ভারতীয় আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহাও আমরা চাহিনা। আমরা আমলার দ্বারা শাসন অর্থাৎ আমলাতন্ত্রই লুপ্ত দেখিতে চাই।

(ছ) অন্যান্য প্রমাণের প্রয়োগ।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রমাণের প্রয়োগে আমি কালবিলম্ব করিতে চাহিনা, কারণ তাহাদের উত্তর অতিশয় সহজ।

দ্বিতীয় পরীক্ষা ঃ—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

লর্ড মেওর শাসনকালে (১৮৬৯-৭২) এককেন্দ্রী শাসন-ব্যবস্থা ভাঙ্গিবার জন্য প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল, (কীন ইহাকেই 'হোমরুল' বলেন!) —এবং তাঁহারই নীতি, অর্থব্যবস্থা বাদ দিয়া অন্যান্য ব্যাপারে লর্ড রিপন কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল। কীন যাহাকে 'হোমরুল' এর বীজ বলিয়াছেন, লর্ড রিপন তাহাতে প্রাণবায়ু সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুনিতেছি, এখন এই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে একটি পরীক্ষা-সাপেক্ষ সীমাবদ্ধ স্থানীয় হোমরুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইবে। যদিও এককেন্দ্রী-শাসন ভাঙ্গিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত কমিশন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের মন্তব্য পেশ করিয়াছেন, তথাপি আজও সকল স্থানে বে-সরকারী চেয়ারম্যান বা সভাপতি নিয়োগ করা হয় নাই। সুতরাং বেশ দেখা যাইতেছে যে দ্বিতীয় প্রমাণেও এই আমলাতন্ত্র অনুপযোগী।

তৃতীয় পরীক্ষা—সদস্য-সভায় কর্ত্তৃত্ব।

মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক-সভার নির্ব্বাচিত ভারতীয় সভ্যগণের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে সম্প্রতি একজন সদস্য বলিয়াছেন যে, উহা একটি প্রহসনমাত্র।

বড় লাটের সদস্য-সভাকে একজন সভ্য "একটি বড় দরের বিতর্ক-সভা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সম্প্রতি অনেকগুলি মন্তব্য দেশীয় নির্ব্বাচিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছিল; তাহার কোন্‌টি গৃহীত হইয়াছিল, কোন্‌টি পরিত্যক্ত হইয়াছিল—সেই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, লাটসভা সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিশেষণগুলি ন্যায্য। মিণ্টো-মর্লি-সংস্কার সম্বন্ধে আমলা-তন্ত্র এই কৃতিত্ব দেখাইয়াছে যে, পার্লামেণ্টের বিধান যে কল্যাণসাধন করিতে চাহিয়াছিল, তাহারা তাহা এক-কালে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। অতএব এই তৃতীয় পরীক্ষার প্রয়োগেও দেখা যায় যে, ভারতবাসিগণকে শাসন-সমিতিতে অধিকার-দান ব্যাপারেও আমলা-তন্ত্র অযোগ্য।

চতুর্থ পরীক্ষা—ভারতবাসিগণকে সরকারী কার্য্যে নিয়োগ।

কমিশনের মন্তব্য হইতেই এ কথা বুঝিতে পারা যায়। এই মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে আমলা-তন্ত্রের দিক্ হইতে কোনরূপ বাধা দিবার প্রয়োজন হয় নাই। কারণ, এই মন্তব্যের দ্বারা আমলা-তন্ত্রের যাহা বিশেষ সুবিধা তাহা সুরক্ষিত হইয়াছে।

গোখ্‌লের পরীক্ষাসমূহের সহিত আমরা আর একটী পরীক্ষার যোজনা করিতে চাই। সেই পরীক্ষায় আমলা-তন্ত্র খুব গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইবে। সে পরীক্ষা এই, রাজাচালনার ব্যয়-বৃদ্ধি করিতে আমলা-তন্ত্র কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে? বর্ত্তমান বৎসরের খাজানার হিসাবে দেখা যায় যে, আয়ের অঙ্ক ৮৬১৯৯৬০০ পাউণ্ড। মোট ব্যয়ের অঙ্ক ৮৫৫৭২১০০ পাউণ্ড। সমগ্র আয়ের অর্দ্ধেকের উপর ব্যয় শাসন-বিভাগে।

দেওয়ানী বিভাগে বেতন ও অন্যান্য ব্যয়	১৯৩২৩৩০০	পাউণ্ড
” বিবিধ ব্যয়	৫২৮৩৩০০	ঐ
সামরিক বিভাগ	২৩১৬৫৯০০	ঐ
একুনে	৪৭৭৭২৫০০	ঐ

এই যে শাসনকার্য্যের অস্বাভাবিক ব্যয়-বাহুল্য ইহার সঙ্কোচসাধন ভারতবর্ষের একটি অত্যাবশ্যক প্রয়োজন; কিন্তু আমরা 'হোমরুল' না পাইলে ইহা কিছুতেই হইবে না।

"হোমরুল" দাবী করিবার যেগুলি গৌণহেতু, সেগুলি যে স্বতঃই অত্যন্ত গুরুতর, ইহা পরিদৃষ্ট হইল। দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। এখন এই জাতিটা একেবারে দেউলিয়া হইয়া যাইবার আশঙ্কা। এই আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার একমাত্র উপায় 'হোমরুল' প্রতিষ্ঠা। এই দারিদ্র্য ইতিপূর্ব্বেই দেশের লোকের পরমায়ু কমাইয়া দিয়াছে, মৃত্যুর হার বাড়াইয়া দিয়াছে, চারিদিকে রোগবিস্তার করিয়াছে, ভূমির উর্ব্বরতাশক্তিও ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সাধারণ জনশ্রেণীর অবস্থা-পরিবর্ত্তনের জন্য কতকগুলি গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধন করা একান্তভাবে প্রয়োজন, নতুবা অনাহার হইতে উদ্ভূত রাষ্ট্রবিপ্লব অনিবার্য্য—এ কথা প্রত্যেক ইতিহাসজ্ঞ যিনি ভারতবর্ষের সাধারণ জনশ্রেণীর বর্ত্তমান দুরবস্থা জানেন, তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছেন। এই যে আর্থিক দুরবস্থা ইহার কারণ অনেক। তাহার মধ্যে একটি এই যে, শাসনকর্ত্তারা বৈদেশিক,—তাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা বোঝেন না। পাশ্চাত্য দেশের উপযোগী শাসন-পদ্ধতি জোর করিয়া প্রাচ্যদেশে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। প্রাচ্যদেশের নিজস্ব যে প্রজাতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহা নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। আমলা-তন্ত্র-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের দ্বারা দেশের অধিবাসিগণ ব্যতিব্যস্ত ও অধঃপাতিত হইয়াছে, কারণ এই পদ্ধতি তাহাদের নিকট একেবারে নূতন এবং ইহাতে তাহাদের বিরক্তিই উৎপাদিত হয়। যাহা হইয়াছে, তাহা লইয়া এখন আর ঝগড়াঝাঁটি করায় লাভ নাই—এখন পরিবর্ত্তন আবশ্যক। একটা অনুপযোগী শাসনপদ্ধতি যখন পূর্ব্ব হইতে উন্নত-সভ্যতাসম্পন্ন দেশের উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে, তখন ইহা নিষ্ফল না হইয়াই পারে না। গরিবেরাই যে বিদ্রোহী হয়, ইহা অতি সত্য কথা। যে দুঃখ তাহারা ভোগ করিতেছে, সেই দুঃখ যখন বিদ্রোহের দুঃখ অপেক্ষা অধিক নহে বলিয়া মনে হয়, তখনই তাহারা বিদ্রোহী হয়। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস ও গ্রাম্যশিল্পের ধ্বংস নিবন্ধন দেশের কোটী কোটী মানবের, যে দৈনন্দিন ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবারণ করিবার জন্য আমরা 'হোমরুল' চাই।

শাসনসংক্রান্ত সংস্কার-সমূহ।

ইহা তিন ভাগে বিভক্ত।—

(১) ভারত-শাসনের সংস্কার।

(২) প্রাদেশিক শাসনের সংস্কার।

(৩) স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের সংস্কার।

আমি এই তিনটি বিষয় বিলোমক্রমে বিচার করাই সুবিধাজনক বিবেচনা করি। তাহা হইলে সমগ্র শাসনব্যবস্থা বনীয়াদ হইতে গড়িয়া তুলিতে পারা যাইবে এবং তাহা হইলে উহা একটি সমঞ্জসী ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি বলিয়া উপলব্ধ হইবে; অংশগুলি কেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে বিন্যস্ত তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু ভ্রান্তি-নিবারণের জন্য প্রারম্ভেই বলিয়া রাখি যে, গত, বৎসর কন্‌গ্রেস-লিগ্‌এর ব্যবস্থাপত্রে যে পরিবর্ত্তন-

সমূহ প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা গৃহীত না হইলে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের কোন ব্যবস্থাই সফল হইবে না। সেই ব্যবস্থাপত্রে যাহা চাওয়া হইয়াছে, তাহাই আমাদের ন্যূনকল্প, তাহা আর কমানো যায় না, কমাইলে সংস্কার আর 'সংস্কার' এই আখ্যা পাইতে পারিবে না। লর্ড রিপনের সময় হইতে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা বরাবর ব্যর্থ তাপ্পি দিয়া সংস্কার করার চেষ্টা হইতেছে এবং সেই দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টাও বিফল হইয়াছে। তাহাতে ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালা ছাড়া আর সকল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভা এখন যেরূপ আছে, সেরূপ থাকিলে—অর্থাৎ সভায় খাস সরকারী ও সরকার-মনোনীত সভ্যের সংখ্যা অধিক, আর শাসন-পরিষদে হয় সকলেই ইংরাজ, নয় ত যেখানে ৪ জন ইংরেজ সেখানে একজন দেশীয় লোক,—আর এই একজন দেশী-লোক কোন আপত্তিজনক ব্যবস্থা নিবারণ করিতে একেবারে অক্ষম, তিনি কেবল মাত্র শিখণ্ডীর মত আছেন,—ঐরূপ ব্যবস্থা থাকিলে, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের সংস্কার অসম্ভব। যেমন মস্তিষ্কে ব্যাধি থাকিলে বা মস্তিষ্ক অপুষ্ট হইলে দেহের স্বাস্থ্য থাকে না, এও ঠিক সেইরূপ;—কারণ, সুস্থ মস্তিষ্ক যদি পরিচালন ও শাসন করে, তবেই সুস্থ শরীর গঠিত হয়। বৈদেশিকগণের দ্বারা পরি-গঠিত পরিচালনমণ্ডলী,—ভারতবাসিগণের যে নিজের দেশ শাসন করিবার আদৌ শক্তি আছে, এমন কথায় বিশ্বাস করে না। এই মণ্ডলী সরকারী নিয়মন ও শাসন কিরূপে ঠিক থাকিবে, এই চিন্তাতেই ব্যস্ত, দেশীয় সভাগণের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখে না। এই যে 'দিদিমা'র শাসন, ইহাতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইঙ্গ-ভারতপ্রবাসিগণ যদি মনে করেন, আমরা সব শিশু—বেশ ভালকথা। শিশুগণ এখন নিজে নিজে হামা টানুক, দাঁড়াইয়া উঠুক, হাঁটিতে চেষ্টা করুক, পড়িয়া উঠুক, এই প্রকারে পড়িতে পড়িতে দেহের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতে শিখিবে। যদি

তাহারা দড়ি ধরিয়া চিরদিন চলে, তাহা হইলে যে তাহাদের পদদ্বয় কখনও ঠিক হইবে না! এই স্থানে আমি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, যে কোন বিভাগে ভারতবাসিগণকে ন্যায্য ও নিরপেক্ষ ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে, সেই সকল বিভাগ পরিচালনেই তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে। যদি ভারতবর্ষ ও গ্রেটব্রিটেনের গবর্মেণ্ট অন্ততঃপক্ষে কন্‌গ্রেস-লীগের দাবীটুকু মঞ্জুর না করিয়া সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন হইতে সংস্কারকার্য্য সুরু করেন এবং সেই স্থানে বা অন্য কোন বিভাগে সফলতার দাবী করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল কালপ্রবাহের তালে তালে পদধ্বনি করিতেছেন,—সত্য সত্য অগ্রসর হইতেছেন না। আমি ভারত-সরকার ও ব্রিটিশসরকারকে অত্যন্ত সরলভাবে ও সাধু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া বলিতে চাই যে ভারতবর্ষ তাহার স্বত্ব দাবী করিতেছে, অধিকার পাইবার জন্য ভিক্ষা করিতেছে না। ভারতবর্ষই বলিয়া দিবে কিসে সে সন্তুষ্ট হইবে।—আমার এই উক্তির সমর্থনে আমি গ্রেটব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন, তাহারই দোহাই দিতেছি;—ভারতবর্ষ অন্য কাহাকেও কর্ত্তা হইয়া বলিতে দিবে না—"এই পর্য্যন্ত পাইবে—আর না!" এ সম্বন্ধে গ্রেটব্রিটেনের প্রজাতন্ত্র আমাদের পক্ষসমর্থন করিতেছে, সম্মিলিত জাতিগণ (মিষ্টার এস্‌কুইথের ভাষায়)—"কেবলমাত্র স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া" আমাদের পক্ষসমর্থন করিতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রজাতন্ত্র আমাদিগকে সমর্থন করিতেছে। ব্রিটেন তাহার চিরাচরিত সংস্কার প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। তাহার দেশের প্রধান প্রধান রাজনীতি-বিদ্‌গণের কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না এবং ইংলণ্ড জগতে যে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের উজ্জ্বল মুকুটমণি স্বরূপ, সেই প্রজাতন্ত্রের মুখে কলঙ্ককালিমা লেপন করিতে পারে না।

প্রজাতন্ত্রের অনুপযুক্ত ?

আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিঃসংকোচে বলা হইয়াছে এবং আমরাও শুনিতে শুনিতে হায়রাণ হইয়া পড়িয়াছি যে, ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্র-শাসনের প্রতিষ্ঠানসমূহ পাইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, চিরদিনই ভারতবর্ষ স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে ছিল। কিন্তু ইহা বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক মত নহে, পক্ষপাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সিভিল-সার্ব্বিসের বিজৃম্ভণ। 'হোমরুল-লীগ'সমূহ কর্ত্তৃক ভারতের বড়লাট বাহাদুর ও মিষ্টার মণ্টেগুর নিকট যে আবেদনপত্র পেশ হইয়াছে, তাহাতে নিম্নোক্ত অতি সত্য কথাগুলি বলা আছে :—

"ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র-শাসন একেবারে নূতন, এ প্রকারের কথা কোন অভিজ্ঞ লোকেই বলিবেন না। মেন্ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন যে, প্রজাতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলতঃ আর্য্যজাতির এবং আর্য্য-জাতির উপনিবেশ-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে বিস্তৃত হইয়াছে। পঞ্চায়ত বা "গ্রাম্য সাধারণতন্ত্র" ভারতবর্ষে অত্যন্ত সুপ্রতি-ষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ছিল। গত শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাধান্যের চাপে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ণ-বিভাগের মধ্যে এখনও তাহা আছে। প্রত্যেক বর্ণ নিজের ভিতরে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাতন্ত্র, তাহার ভিতরে একই লোকের রাজপুত্রের সহিত ও দরিদ্র কৃষকের সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারে। টাকা এবং উপাধির উপর সামাজিক সম্মান তেমন নির্ভর করে না, বিদ্যা ও বৃত্তির উপর যেমন নির্ভর করে। ভারতবর্ষ তাহার অন্তরের অন্তরে প্রজাতান্ত্রিক। অতীতকাল হইতে যে সমুদয় প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষ পাইয়াছে, তৎসমুদয় এবং এখনও যে সমুদয় প্রতিষ্ঠান তাহার অধীনে আছে, সে সমুদয়, প্রজাতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজেরও সাক্ষ্য আছে—সারজন লরেন্স, আজ নহে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ নিজেদের কার্য্য নিজে নিজে পরিচালনা করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম এবং স্বায়ত্তশাসন চালাইবার প্রবৃত্তি তাহাদের হৃদয়ে গভীররূপে নিহিত। পল্লী-সমাজসমূহ প্রত্যেকেই এক একটি সাধারণ-তন্ত্র এবং ভারতের প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে এগুলি সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী। আমরা ভারতবর্ষে যে স্থান অধিকার করিতেছি, তাহাতে কর্ত্তব্য ও নীতি উভয়েই আমাদের বলিবে যে, দেশের কাজের যতটা অংশ সম্ভব দেশের লোককে করিতে দেওয়াই আমাদের উচিত।"

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সার বার্‌টল্ ফ্রেয়ার লিখিয়াছিলেন—"ভারতের সামাজিক কাজকর্ম্ম কি ভাবে পরিচালিত হয়, তাহা যিনি মনোযোগের সহিত দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, প্রতিনিধি-নিয়োগ ইহাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি—কেবল সংস্কার-আইনের বিধান মতে নির্ব্বাচন দ্বারা নহে—ইহাদের পূর্ব্বাপর এমন সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাতে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোক প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হয়। যখনই কোন গোলমাল উপস্থিত হয় এবং সরকারবাহাদুরকে কোন কিছু জানাইবার আবশ্যক হয়, তখনই তাহারা এইরূপ করে—তখনই তাহাদের মধ্যে এই ভাবে সে বিষয়ের আলোচনা হয়। যখনই সমাজের কোন লোককে পুরস্কার দিতে বা শাস্তি দিতে হয়, তখনই সেই বর্ণের একটী সভা হয়। আমার মনে হয়, এই জাতির বিশিষ্ট প্রকৃতিই এই ধরণের। যেমন প্রাচীন স্যাক্‌সন্ জাতিদের ছিল—তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবের লোকসমূহকে সভায় একত্র করিয়া প্রত্যেকের মত লইয়া কাজ করিত, এও ঠিক সেইরূপ।"

মিষ্টার চিশহলম্ এনষ্টি বলেন—"আমরা যখন পূর্ব্ব দেশের অধিবাসিগণকে শিক্ষাদান করিয়া মিউনিসিপ্যাল কাজের জন্য এবং মহাসভার শাসন-

প্রণালীর জন্য গড়িয়া তোলার কথা বলি, তখন আমরা ভুলিয়া যাই যে, মিউনিসিপ্যালিটি জিনিষটারই উৎপত্তি পূর্ব্ব-দেশে। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন এই কথাটাকে খুব ব্যাপকভাবে বুঝিলে যতদূর ইহার অর্থ যায়, তাহার সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্ব্বদেশে যত প্রাচীন, এদেশে ঠিক তত প্রাচীন নহে। দেশের অধিবাসিগণ যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন, যাহারা পূর্ব্বদেশের অধিবাসী তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে এমন স্থান নাই, যেথানে অসংখ্য স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠান নাই। কেবল তাহাই নহে, আমাদের প্রাচীন মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মত তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত গ্রথিত—সমস্তগুলি একখণ্ড জালের মত; কাজেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যবস্থার কাটামো একেবারে প্রস্তুত হইয়াই পড়িয়া আছে।"

এ প্রকারের প্রমাণ-বচন আমি অসংখ্য উদ্ধার করিতে পারি—কিন্তু উদ্ধার করিয়া কি হইবে? যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা সকলেই ইহা জানেন—আর যাঁহারা অন্যরূপ, তাঁহাদের নিকট যতই জোরে বলা হউক, তাঁহারা স্বীকার করিবেন না।

এই ভূমিকার পর আমি স্বায়ত্তশাসনের আলোচনা করিতেছি।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর সংস্কার।

(ক) সাধারণ বিধানসমূহ।

আমাদিগকে তিনটি ক্ষেত্রের অয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে—(১) গ্রাম, (২) গ্রামগুচ্ছ—অল্প বা অধিক ব্যবধানবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম; উহার মধ্যে যে জমি আছে, সে জমিগুলিও ইহার মধ্যে, (৩) জেলা—যাহার মধ্যে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন তালুক ও তহশিল আছে, তাহা ছাড়া

সরকারী পতিত জমি ও বন আছে। প্রাচীনকালের গ্রাম পত্তনের একটী অতি আনন্দকর স্মৃতি ইহার মধ্যে আছে। প্রত্যেক গ্রামের শীর্ষস্থানে একজন করিয়া প্রধান থাকিতেন, দশখানি গ্রামের এক একটি গুচ্ছের শীর্ষ-স্থানে তদপেক্ষা উচ্চপদস্থ একজন প্রধান থাকিতেন, একশতখানি গ্রামের শীর্ষস্থানে একজন আরও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি,—এই প্রকারে দশের গুণক অবলম্বনে সমুদয় ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীনেরা এই প্রকারের নিয়ম-বদ্ধ আরোহপ্রণালী পসন্দ করিতেন, তাঁহারা সজীব ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা দেখিতে ভালবাসিতেন।

গ্রামের অধিবাসী গৃহস্থমাত্রেই প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকারী হইবেন, কারণ ব্যবস্থা এই হইবে যে, "যাহার ফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে, তাহা সকলের দ্বারাই বিচারিত হওয়া উচিত।" এই ব্যবস্থায় দেশের প্রত্যেক পুরুষের ও স্ত্রীলোকের দেশের কাজে অধিকার হইবে। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে যে সমুদয় ব্যবস্থার সহিত তাহাদের অতি নিকট সম্বন্ধ, সেই সমস্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকারী হইবে, আর পরোক্ষভাবে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় সমস্ত দেশের শাসনেও তাহাদের হাত থাকিবে। আমাদের মন্ত্রণা-সভাতেও, কি প্রাদেশিক মন্ত্রণাসভা, কি সর্ব্বভারতীয় মন্ত্রণাসভা —সর্ব্বত্রই যেমন যেমন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বাড়িবে তেমনি প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ব্যক্তিমাত্রেই অধিকার পাইবে। আপাততঃ আমরা ইংলণ্ডদেশের অনুবর্ত্তনে শ্রমজীবিগণকে কেবল স্থানীয় সভার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচনেই অধিকার দিতেছি। প্রাদেশিক মন্ত্রণাসভায় যাহারা সদস্যনির্ব্বাচন করিবে, তাহারা ও তালুক বোর্ডের নির্ব্বাচনকারীরা এক পর্য্যায়ভুক্ত।

তাহার পর কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা বিভাগের সময় এই ব্যবস্থা করিতে চাই যে, যাহা কেবলমাত্র গ্রামের তাহা পল্লীসমিতির দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইবে,

কিন্তু গ্রামের যে সমুদয় প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র গ্রামের জন্য নহে, গ্রাম অপেক্ষা বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের অংশ বিশেষ, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান উচ্চতর, যে সমিতি, তাহার অধীন হইবে এবং গ্রাম্য-সভাকে তাহার যতটুকু পরিচালনা করিতে হইবে, ততটুকুর জন্য পল্লীসমিতিকে উচ্চতর সমিতির নিকট দায়ী থাকিতে হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ একটি বিদ্যালয় লইয়া আলোচনা করা যাউক। মনে করুন, এ স্থলে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয় এবং প্রাদেশিক সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। তাহার অধীনে থাকিবে প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজসমূহ, উচ্চবিদ্যালয়সমূহ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ, প্রাথমিক শিক্ষালয়সমূহ এবং সাধারণকে হস্ত-শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যেকের সহিত সংশ্লিষ্ট তদুচিত শিল্পবিদ্যালয়, এবং যাহারা জীবিকার জন্য ব্যবসায় শিক্ষা করিবে, তাহাদের জন্য কারখানায় বিশেষ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সেই গ্রামে যে ব্যবসায় আছে, সেই ব্যবসায়ের জন্য কারখানা থাকিবে। সম্ভবতঃ প্রত্যেক ফিরকায় (Revenue Circle) একটি করিয়া মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় থাকিবে; প্রত্যেক তালুকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় থাকিবে, অনেক তালুকেই একটির বেশী থাকিবে, প্রত্যেক জেলায় একটি বা একাধিক কলেজ থাকিবে, এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবে। কিন্তু গ্রাম্যপঞ্চায়ত কেবলমাত্র তাঁহার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং দেখিবেন যে, যে সমুদয় বালকবালিকার ভবিষ্যৎ আশা আছে, তাহারা ফিরকার মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। এই প্রকারে এই বিদ্যালয় গ্রামের বাহিরের ব্যাপকতর জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে; কিন্তু তাহাদের শাসনের অধিকার কেবলমাত্র নিজেদের বিদ্যালয়টির উপর থাকিবে। তাহারা

দেখিবে যে, সমস্ত প্রদেশের শিক্ষার যে ভাগের ঐ গ্রাম অংশী, সেইটুকু যথাযথ পালিত হইতেছে।

(খ) পঞ্চায়ত।

স্মরণাতীতকাল হইতেই ভারতবর্ষে গ্রাম্য-সমাজের অস্তিত্ব ছিল, এবং সেই সমাজে যথেষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থাও ছিল, ইহা সকলেই জানেন। ভারতবর্ষের কোনও কোনও স্থানে অনেক লিপি ও কাগজপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে দক্ষিণ-ভারতবর্ষে গত শতাব্দী পর্য্যন্তও যে ব্যবস্থা ছিল, তাহার একটী চিত্র আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি। এই ব্যবস্থা ব্রহ্মদেশে এখনও আছে। সার টমাস মন্‌রো কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক রায়তওয়ারী বিধানের দ্বারা এই ব্যবস্থার প্রাণহানি হইয়াছে; ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই প্রাচীন ব্যবস্থা দিন দিন প্রাণশূন্য হইয়া পড়িতেছে। শ্রীযুক্ত সি, পি, রামস্বামী আয়ারের যে পুস্তিকা হইতে পূর্ব্বে বচন উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই পুস্তিকায় তিনি নিম্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দশমখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়, সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানগুলি গ্রামের লোকেরা সমবেতভাবে গঠন করিতেছে, এবং রক্ষা করিতেছে। অধ্যাপক রিজ্ ডেভিস্ বলেন, "বৌদ্ধ-গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, গ্রামবাসিগণ তাহাদের সমুদয় শক্তি সংঘ-বদ্ধ করিয়া মহল্লা ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করিতেছে, তাহাদের নিজের গ্রাম হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা সংস্কার করিতেছে, এবং সাধারণের ব্যবহার্য্য উদ্যানও রচনা করিতেছে। (পি, ব্যানার্জি কৃত "প্রাচীন-ভারতে শাসন-পদ্ধতি" গ্রন্থের ২৯৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। এখনও মহীশূরে বহুগ্রামে গ্রামবাসিগণ প্রত্যেকে প্রতি সপ্তাহে অর্দ্ধদিনের পরিশ্রম বিনা মজুরীতে সাধারণের হিতকর কার্য্যে দান করে,

এবং এই প্রকারে যে কার্য্য হয়, তাহার সমষ্টি বিস্ময়জনক। যে সময়ে অর্থশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে— প্রত্যেক গ্রাম সাধারণ দেশ-শাসন-ব্যবস্থার একটি অত্যাবশ্যক অংশ ছিল—গ্রামই সমগ্র শাসন-সৌধের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। সিংহলদ্বীপে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সামাজিক ধর্ম্মাধিকরণে ফৌজদারী বিচারও গ্রামবাসীরাই করিত। সে সময়কার গ্রামের লোকে যে কেবল শাসন-কার্য্যে সাহচর্য্য করিত, তাহা নহে, বিচার-বিভাগের কার্য্যপরিচালনেও তাহারা সাহায্য করিত। মান্দ্রাজ গবর্মেণ্টের প্রশংসা করিতে হয় যে, সার্ টমাস মন্‌রো সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইলেও মান্দ্রাজের বোর্ড অফ্ রেভিনিউ গত শতাব্দীর প্রথমাংশে গ্রামের প্রাতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সার্ টমাস মন্‌রোর অভিপ্রায় মত কার্য্য হওয়ায় গ্রাম্য সমাজসমূহের প্রাণহানি হইয়াছে।”

মহীশূরের ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দের শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যবিবরণীতে ২৭০ পৃষ্ঠায় “গ্রামের উন্নতিসাধন-ব্যবস্থা” প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, গ্রামবাসিগণ নগদে ও শারীরিক শ্রমে ঐ বৎসর ৪৭০৮৩ টাকা দিয়াছে, আর রাজসরকার ৪৪৯৭৮ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ— “ঐ গ্রাম্য-সমিতিসমূহ এই কার্য্যে বরাবর বিশেষ আগ্রহের পরিচয় দিতেছে, এবং তাহাদের চেষ্টায় রাজ্যের সর্ব্বত্র সাধারণের হিতকর বহু কার্য্য, যেমন বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ, কূপখনন, রাস্তা-নির্ম্মাণ, জঙ্গল-পরিষ্কার, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি কার্য্য হইতেছে।”

ঐ বৎসর চারিটি জেলায় গ্রাম্যসমিতিসমূহের সম্মিলনী হইয়া ছিল। কার্য্যকরী সমিতিসমূহ কি করিয়াছে, তাহার হিসাব লইবার জন্য, গ্রামের অধিবাসিগণের অভাব-অভিযোগ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, এবং

গ্রামসমূহের আর্থিক ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য কি কি করা দরকার, তাহার কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্ধারণের জন্য ও তাহা কি প্রকারে কার্য্যে পরিণত করা যায়, তাহার উপায়-উদ্ভাবনের জন্য এই সম্মিলনীসমূহের অধিবেশন হইয়াছিল। গ্রামবাসিগণ আনন্দের সহিত সেই সামাজিক কার্য্যে যোগদান করে। কারণ, এই সমুদয় কার্য্য তাহাদের চিরাচরিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহারা গ্রামের উন্নতির জন্য সানন্দে বিনা মজুরিতে পরিশ্রম করিয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইল। প্রাচীন কালে সামাজিক বাধ্য-বাধকতার যে ভাব ছিল, তাহা এখনও আছে এবং মহীশূরের রাজসরকার বুদ্ধিমানের মত ইহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন ও যাহাতে ইহার বৃদ্ধি হয়, সেজন্য চেষ্টা করিতেছেন।

গ্রামের লক্ষণ এইরূপ ছিল—এক জায়গায় অনেকগুলি বাড়ী—তাহার চারিদিকে অনেকখানি কর্ষিত ও অকর্ষিত জমি—প্রত্যেক অধিবাসীর নিষ্কর বাসগৃহ, উঠান ও বাগান। গ্রামে যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী ও শিল্পী ছিল, তাহারা গ্রামের কাজ করিয়া নগদ কিছু পাইত না, তাহাদের জমি দেওয়া থাকিত, এবং গ্রামের উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ তাহারা পারিশ্রমিক হিসাবে পাইত। গ্রামের কর্ম্মচারীর মধ্যে—একজন মণ্ডল, একজন সরকার, একজন চৌকিদার (তাহাকে পুলিশের কাজও কিছু কিছু করিতে হইত) একজন সীমানির্দ্দেশক বা আমিন, জলাশয় ও নদীনালার একজন পরিদর্শক, একজন পূজারি, একজন শিক্ষক, একজন জ্যোতিষী, একজন চিকিৎসক, একজন গায়ক, একজন কবি, একজন নর্ত্তকী, একজন নাপিত, একজন রজক, একজন গোপালক, একজন কুম্ভকার, একজন কর্ম্মকার ও একজন সূত্রধার। যথারীতি নির্ব্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা গঠিত গ্রাম্য-সমিতি কর্ত্তৃক গ্রাম শাসিত হইত এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য শাখা-সমিতি থাকিত। সমস্ত

জমি সমাজের যৌথ ছিল, তবে মাঝে মাঝে তাহার নূতন বন্দোবস্ত হইত। প্রত্যেক গৃহস্থেরই ভোট ছিল বলিয়া মনে হয়, তবে পঞ্চ বা সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে হইলে কিছু গুণের দরকার ছিল।

সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড কর্ত্তৃক ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত বিকেন্দ্রীকরণ তদন্ত-সমিতিতে (ডিসেণ্ট্রালিজেশান কমিশন) ৫ জন ইংরাজ ও একজন এঁদেশের লোক রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন। তাহার বিবরণীর তৃতীয় খণ্ডের ১৮শ অধ্যায় ৬৯৪ প্যারায় দেখিতে পাই,—

"ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই সরকারী শাসন-ব্যবস্থায় গ্রামই রাজ্য-তন্ত্রের প্রাথমিক মূল উপাদান—গ্রাম হইতেই বৃহত্তর শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে।"

গেজেটিয়ারে সংগৃহীত প্রাচীন প্রমাণ হইতে গ্রাম ও তাহার প্রথামূলক বিধি, তাহার কর্ম্মচারী, শিল্পী ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্তরূপ বর্ণিত দেখিতে পাই। বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, এই সমুদয় গ্রামে পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন ছিল, কিন্তু "এখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা, আধুনিক করসংগ্রহের ও পুলিশের ব্যবস্থা, যাতায়াতের সুবিধা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক প্রজাসত্ত্ববিধান প্রভৃতি—যাহা ক্রমশঃ উত্তরভারতবর্ষেও বিস্তৃত হইতেছে, তাহার ফলে এই স্বায়ত্তশাসন এখন লোপ পাইয়াছে। তাহা হইলেও এখনও গ্রামই শাসন-তন্ত্রের মুখ্য উপকরণ। গ্রামের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ—অর্থাৎ মণ্ডল, সরকার, গ্রাম্য চৌকিদার প্রভৃতি এখন গবর্মেণ্টের বেতনভুক্ এবং গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত। এখনও কিছু কিছু স্বগ্রাম সম্পর্কে আত্মীয়তার ভাব ও সাধারণ স্বার্থবোধ আছে।"

"গবর্মেণ্টের বেতনভুক্" এই কথাটিতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, প্রাচীন গ্রাম্যপদ্ধতি কি প্রকারে ধ্বংস করা হইয়াছে। বেতনভুক্ হইলে

লোক উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর ভৃত্য হইয়া পড়ে; আর নিম্ন কর্ম্মচারী—তহশিলদার, ডেপুটি-কলেক্টর, কলেক্টর প্রভৃতি উচ্চ কর্ম্মচারীর প্রতিই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের জন্য চাহিয়া থাকে, গ্রামের লোকের প্রতি নহে। এই প্রকারে তাহারা গ্রামের সেবক না হইয়া পীড়ক হইয়া পড়ে এবং স্বগ্রামবাসীর প্রতি যে দায়িত্ববোধ—যাহা গ্রাম্যজীবনের সর্ব্বস্ব—তাহা ধ্বংস হইয়া যায়।

ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ইংরাজের শাসনাধীনে পল্লীসমাজ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবে এই কার্য্যবিবরণী জোরের সহিত অনুরোধ করিয়াছেন যে, সেগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক। দেখা যায় যে, কমিশনে কোন কোন সাক্ষী সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, "দেশের অধিবাসিগণের কি তেমন উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনভাব আছে যে, তাহারা গ্রামে সামান্য একটু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে?" আমলাতন্ত্রের যাহা প্রাণের কথা, তাহাও ঠিক ইহাই। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া গ্রামগুলি স্বায়ত্তশাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কত আক্রমণ হইয়া গিয়াছে, শাসনের কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, তথাপি তাহারা জীবিত ছিল। আর আজ তাহারা দেড় শত বৎসর ইংরাজশাসনের অধীনে থাকিয়া নিজেদের কাজ চালাইতে অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে! ইহাই তো সাক্ষীর মনের কথা। যে শাসনকে উন্নতিকর বলা হয়, সেই শাসনের অধীনে এমন আশ্চর্য্য অধঃপতন কেন হইল? কারণ আর কিছুই নহে, আমলাতন্ত্রের বাঁধা ছাঁধা নিয়মের বন্ধনই এই কারণ। যাহা কিছু আমলাতন্ত্রের মনোমত হয় নাই, তাহাই তাহারা কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে। শাসনকার্য্যের জন্য গ্রামবাসীদের নিজস্ব বিধিব্যবস্থা ছিল, তাহাতে তাহাদের কাজকর্ম্ম ভালরূপ চলিয়া যাইত। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের পদ্ধতি ভিন্নরূপ, সুতরাং গ্রামবাসীদের পদ্ধতি খারাপ। একমাত্র 'হোমরুলই' গ্রামের শাসন পুনর্ব্বার সংনদ্ধ করিবে।

যাহা হউক, ঐ কার্য্যবিবরণী পঞ্চায়ৎ-পদ্ধতির উন্নতি চাহিয়াছে—৭৩৬ প্যারায় বলা হইয়াছে :—

"আমরা মনে করি যে, যখন স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, গ্রামে পঞ্চায়ৎ-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আরব্ধ হওয়া উচিত, তখন অতঃপর জেলা অপেক্ষা অল্প আয়তনের ভূখণ্ড লইয়া বোর্ড গঠন আবশ্যক; সেই জন্য আমাদের ইচ্ছা, সর্ব্বত্র জেলার অধীনে ছোট ছোট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হউক। সেই গুলি গ্রাম্য বোর্ড ব্যবস্থার প্রধান যন্ত্রস্বরূপ হইবে।"

দুঃখের বিষয়, এই বিবরণীতে এমন একটি সর্ত্ত নিবিষ্ট হইয়াছে যে, ইহার উদ্দেশ্য যতই সাধু হউক, উহার সাফল্য একেবারেই অসম্ভব। কারণ, কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ,—"ইহা একান্তাবশ্যক যে, পঞ্চায়ৎ-ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে জেলার কর্ত্তৃগণের দৃষ্টির ও তত্ত্বাবধানের অধীন থাকিবে। গ্রামের সমস্ত কার্য্যের পরিদর্শন এখন যেরূপ তহশীলদার ও মহকুমার কর্ত্তার অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য, পরেও তাহাই থাকিবে।"

একটী শিশুর হস্তপদ বন্ধন কর, এবং তাহার পর তাহাকে বল যে, সে হাঁটিতে শিখুক। যদি সে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দাও। স্বাধীন শিশু আছাড় খাইয়া খাইয়াই দেহের ভারকেন্দ্র রক্ষা করিতে শিখে। শিশুকে বাঁধা রাখিলে সে চলচ্ছক্তিবিহীন হইয়া পড়ে, এবং কখনই হাঁটিতে শিখে না।

মাননীয় মিঃ টি, রঙ্গচারিয়ার যে সুন্দর ব্যবস্থাটি মান্দ্রাজের মন্ত্রণা-সভায় প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন, আমি আশা করি যে, ভারতসচিব মহাশয় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আইনের দ্বারা পঞ্চায়ৎ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবেন। আমি মিঃ রঙ্গচারিয়ারের সযত্ন-রচিত ও মূল্যবান্ ব্যবস্থাপত্রটি ভারতসচিবকে

দিয়াছি। ইহা অসম্ভব নহে যে, যাহা মান্দ্রাজে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা পার্লামেণ্টে গৃহীত হইবে।

পঞ্চায়ৎ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি অন্যত্র যাহা বলিয়াছি, এথানে তাহা উদ্ধার করিলাম।—

গ্রামের প্রয়োজনগুলি এই প্রকারে জ্ঞাপিত হইবে। যদি দরকার হয়, তাহা হইলে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট পঞ্চায়ৎ তাহা বিজ্ঞাপন করিবেন। গ্রামের যাহা বক্তব্য, পঞ্চায়তের মারফত গ্রাম তাহা ব্যক্ত করিবে। আর তাহারা এথনকার মত পরমুথাপেক্ষী থাকিবে না। গ্রামগুলি বৃহত্তর জীবনের সাহত সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত হইবে। পঞ্চায়ৎ গ্রামে বক্তাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে পারিবেন। গ্রামের লোক যাহাতে বিচার-বিতর্ক করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন, গ্রামবাসিগণের জন্য আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়ার বন্দোবস্ত করিবেন। সমগ্র গ্রাম্য-জীবনকে আরও উন্নত করিতে হইবে, নানারূপ ব্যবস্থার দ্বারা আরও প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করিতে হইবে। আর এক কথা এই যে, প্রত্যেক গ্রাম একটী গ্রামগুচ্ছের অন্তর্গত থাকিয়া, অন্যান্য গ্রামের সহিত যে তাহার যোগ আছে, ইহা অনুভব করিবে, এবং এই প্রকারে বৃহত্তর সংহত জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে বিরাজ করিবে।

গ্রাম যেমন সমগ্র দেশের শাসন-ব্যবস্থারূপ সমষ্টির ব্যষ্টি, ওয়ার্ডগুলিও সহরের পক্ষে সেইরূপ। গ্রামে যেমন পঞ্চায়ৎ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সহরেও তেমনই প্রত্যেক গৃহস্থের ভোট লইয়া ওয়ার্ড-পঞ্চায়ৎ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যে সমস্ত সহরের লোকসংখ্যা ৫ হাজারের অধিক, তাহার প্রত্যেকটীতে মিউনিসিপ্যালীটির অধীনে ওয়ার্ড-পঞ্চায়ৎ-সমূহ থাকিবে। যে সমুদায় সহরের লোকসংখ্যা ৫ হাজারের কম, তথায় মিউনিসিপাল কর্ত্তৃত্বের পরিবর্ত্তে ওয়ার্ড-পঞ্চায়তের হাতে কর্ত্তৃত্বভার

থাকিবে। এই সমুদয় ওয়ার্ড-সভা সহরের ছোট ছোট ব্যাপারগুলির ভার গ্রহণ করিবে। এখন এই সমস্ত ব্যাপার উপেক্ষিত হয়। কারণ, মিউ-নিসিপ্যালীটীর উপর কাজের ভার এত বেশী যে, এগুলি তাহারা যথাযথ দেখিতে পারে না। প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ভার ইহাদের উপর থাকিবে। জঞ্জাল পরিষ্কার ও সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা, পথ ও শৌচাগার পরিষ্কার রাখা, ভাড়ার গাড়ী ও অন্যান্য গাড়ীর বিশ্রামস্থান গুলির পর্য্যবেক্ষণ, ঘোড়া ও অন্যান্য পশুর জলপান করিবার চৌবাচ্চাসমূহের পরিদর্শন, খাদ্যদ্রব্য-পরিদর্শন ও ভেজাল-নিবারণ, স্থানীয় বিচারক নিযুক্ত করিয়া মোকর্দ্দমা নিবারণের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের মত সালিসের সাহায্যে ছোট ছোট মামলার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা, কারখানা, কূপ প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ, এই সকল কার্য্য স্বভাবতঃই ওয়ার্ড-সমিতির হস্তে যাইয়া পড়িবে। যেখানে মিউ-নিসিপ্যালিটি আছে, সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড-সমিতির হস্তে যে সমস্ত কার্য্যের ভার দেওয়া সঙ্গত মনে করেন, সে সমুদয় কার্য্যের ভার দিবেন।

(গ) তালুক বা তহশিল বোর্ড।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-সোপান-পরম্পরার যাহা পরবর্ত্তী সোপান তাহা পঞ্চায়ৎ ও জেলাবোর্ডের মধ্যবর্ত্তী সমিতি। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ইহার নাম বিভিন্ন হইবে। আমাদের মান্দ্রাজে সমুদয় প্রদেশ ২৬টী জেলায় বিভক্ত; আর এই ২৬টী জেলা ৯৬টী তালুকে বিভক্ত। সুবিধার জন্য সাধারণ ভাবে এই তালুকগুলিকে সব্-ডিষ্ট্রিক্ট বলা যাইতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের কার্য্যবিবরণীতে এই নামই ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এই তালুক বা মান্দ্রাজের বাহিরে তাহার যাহা নাম, সেই স্থানগুলি, একটী বোর্ডের দ্বারা শাসিত হইবে। বিবরণীতে এগুলিকে সব্-জেলা-বোর্ড বলা হইয়াছে, কিন্তু পঞ্চায়ৎ ও জেলা-বোর্ডের মধ্যবর্ত্তী বোর্ড কর্ত্তৃক শাসিত

ভূখণ্ডের পূর্ব্ব হইতেই তালুক বা তহশীল, এই নামটী থাকায়, তালুক বা তহশীল বোর্ড এই নামটী আপনা হইতে মনে আসে। প্রত্যেক তালুক বা তহশীলে যে বোর্ড থাকিবে, তাহার সদস্যগণ, তৎশাসনাধীন ভূখণ্ডের পঞ্চায়ৎগণ ও ফিরকার ভোটদাতৃগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। ভোট দিবার অধিকার সম্পত্তি দেখিয়া নির্দ্ধারিত হইবে, এবং সময়ে সময়ে তাহা সংশোধিত হইবে। পঞ্চায়ৎগণ সাধারণের কাজ করেন বলিয়া আর একটী ভোটের অধিকারী হইবেন, এবং তাঁহাদের যিনি প্রধান তাঁহাকে তালুক-বোর্ডে পাঠাইয়া তাঁহার নিজের গ্রামের যে যে বিশেষ স্বার্থ, সে গুলি বিবৃত করাইতে পারিবেন। বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন খুব জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-পদ্ধতির বিধানে এই বোর্ড-গুলি অত্যন্ত আবশ্যক অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই বোর্ডগুলির হস্তে আবশ্যক মত অর্থ ও উপযুক্ত ক্ষমতা দিতে হইবে, এবং তাহাদের বহুলপরিমাণে স্বাধীনতা থাকিবে। মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়, উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, গ্রামে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, এবং সহরে কলাভবন রক্ষা করা, তালুক বা তহশীল-বোর্ডের কার্য্য হইবে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যে রাস্তা গিয়াছে, সেই সকল রাস্তা, দরকার হইলে এই সকল রাস্তায় আলো দেওয়া, গ্রামের বাহিরে অথচ তালুকের ভিতরের পয়ঃপ্রণালী ও সেচের খাল, এই সমুদয় ইহাদের অধীন থাকিবে। তাহারা যৌথসমিতিসমূহ গঠন করিবে; যেখানে এ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেখানে গ্রামবাসিগণকে ভাড়া দিবার জন্য কৃষিকার্য্যের যন্ত্রসমূহ রাখিবে। শস্যসঞ্চয় করিবার ভাণ্ডার, গোপালন ও দুগ্ধ সরবরাহের ভাণ্ডার, এবং বৎস-উৎপাদনের জন্য বৃষ ও ঘোটক উৎপাদনের জন্য অশ্বের ব্যবস্থা করিবে। আসল কথা, যেখানে যৌথ-সমিতি নাই, সেখানে তাহারা কৃষি ও শিল্পের সুব্যবস্থার যাবতীয় বিধান সম্পন্ন করিবে।

(ঘ) জেলা বোর্ড।

আমাদের মধ্যে এমন অনেক রাজনীতিক সংস্কারক আছেন, যাঁহারা জেলা বোর্ড তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। আমি এখন যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে জেলা-বোর্ডগুলি রাখাই সঙ্গত মনে করি।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের তৃতীয় সোপান—গ্রাম-দেশে জেলাবোর্ড-সমুহ, আর বড় বড় সহরে মিউনিসিপ্যালিটীসমূহ। অধীনস্থ তালুক-বোর্ডসমুহ ও তালুকের সাধারণ ভোটদাতারা জেলা-বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন। যেমন পঞ্চায়ৎগণ সাধারণের কার্য্য করেন বলিয়া একটী দ্বিতীয় ভোটের অধিকারী, তালুক-বোর্ডের সভ্যগণও সেইরূপ আর একটী ভোটের অধিকারী হইবেন।

সমগ্র জেলার সহিত যে সমুদয় ব্যাপারের সম্বন্ধ, সেই সমুদয় ব্যাপার জেলা-বোর্ডের হাতে থাকিবে। তাহারা তালুক-বোর্ডের সমুদয় কার্য্য পরিদর্শন করিবে, তালুক-বোর্ডের বিচারনিষ্পত্তির বিরুদ্ধে পঞ্চায়ৎগণ কোনও আপীল করিলে, তাহার নিষ্পত্তি করিবে। স্থানীয় করের কত অংশ তালুক আদায় করিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে; এবং প্রাদেশিক সভা জেলার জন্য যাহা মঞ্জুর করিবেন, তাহার কত অংশ কোন্ তালুক পাইবে, তাহাও নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। জেলা-বোর্ড জেলার সাধারণ পূর্ত্ত-বিভাগের জন্য ইঞ্জিনীয়ার, তালুকের উচ্চ শ্রেণীর ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক প্রভৃতি, নিযুক্ত করিবে। সরকারী রাস্তা, স্থানীয় রেল, খাল প্রভৃতি তাহাদের হাতে থাকিবে। জেলার সদর-সহরে জেলার আপিস আদালত প্রভৃতি এবং শিল্পবিজ্ঞান, কৃষি, হস্তশিল্প প্রভৃতির জন্য কলেজসমূহ থাকিবে।

এমন কি, লর্ড রিপণের সময়েও, স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিস্বরূপ দুই একটি

দুর্ব্বল প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। কীন বলেন, "হোমরুলে'র বীজ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, কেবল যে পল্লীগ্রামেই প্রাচীন ও চিরাগত প্রতিষ্ঠান-সমূহ ছিল—যাহাদের কথা সর্ব্বদাই বর্ণিত হইয়া থাকে.—তাহা নহে, ছোট ও বড় সহরে স্থানীয় সভা কর্ত্তৃকই জঞ্জাল পরিষ্কার এবং রাস্তাগুলি ঠিকঠাক রাখা প্রভৃতি কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইত।"

এই কয় বৎসরে উন্নতি খুব কম হইলেও কিছু উন্নতি হইয়াছে। যখন বোর্ডের সমুদয় সদস্যই নির্ব্বাচিত সদস্য হইবেন, সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইবেন, এবং শাসিত অয়নের উপর বোর্ড প্রকৃত কর্ত্তৃত্বলাভ করিবে তখন ক্ষিপ্রগতিতে উন্নতি হইবে। 'হোমরুলের' অত্যাবশ্যক অংশরূপে যখন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন আমরা দেখিতে পাইব যে, গ্রাম্য পঞ্চায়তেরা তুড়ুমঠোকা, বেতমারা প্রভৃতি অপমানজনক শাস্তিসমূহ উঠাইয়া দিয়াছে, এবং গ্রামবাসিগণ মর্য্যাদার অনুরূপ স্বাধীন মনুষ্যের প্রাপ্য ব্যবহার পাইতেছে। অধিকন্তু সুবিধামত কেন্দ্রসমূহে কৃষিশিক্ষা দেওয়া হইতেছে, এবং শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহীশূরে এই প্রকারের তিনটী কৃষিক্ষেত্র আছে। এই প্রকারের পদ্ধতি প্রচলিত হইলে উন্নততর কৃষি-পদ্ধতির অবলম্বন, উপযুক্ত সার ও উৎকৃষ্ট বীজপ্রাপ্তি বিষয়ে রায়তগণকে সাহায্য করা হইবে। বনবিভাগের আইন-সমূহ পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং প্রাচীনকালে যেমন পশুচারণের জন্য ভূমি প্রদত্ত হইত, সেইরূপ দেওয়া হইবে। শেষ কার্য্যবিবরণীতে দেখিতে পাই যে,—মহীশূর-রাজ্যে ছাগল ছাড়া অন্যান্য সমুদয় গৃহপালিত পশুদের চারণের জন্য বনের অধিকাংশ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের যেমন অবস্থা, সেই অবস্থার উপযোগী গ্রাম্য বিদ্যালয়সমূহ পঞ্চায়তগণ পরিদর্শন করিবেন, অধিকবয়স্ক রায়তগণের মধ্যে যাহারা লেখাপড়া শিখিতে চাহে, তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন। আর তালুকবোর্ড, যেরূপ বলা

হইল, সেইরূপে ষাঁড়রক্ষা, শস্যসঞ্চয়, কৃষিযন্ত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। ন্যায্য ভাড়া দিয়া লোকে তাহা ব্যবহার করিবে। ভাল বুদ্ধিমান ছেলেদের বৃত্তি দিয়া, যাহাতে তাহারা স্কুল হইতে কলেজে যাইতে পারে, বা ভালরূপ কৃষিশিল্প অথবা হস্তশিল্প শিক্ষা করিতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। এই সমস্ত স্বপ্ন-কথা নহে, অন্যান্য সভ্যদেশে যেখানে হোমরুল আছে, সেখানে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। জাপানের সম্রাটের শিক্ষাবিষয়ক অনুজ্ঞা—যাহা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, তাহাতে তিনি আদেশ করেন যে, "আজ হইতে এমনভাবে শিক্ষার বিস্তার করা হইবে যে, কোনও গ্রামে একটিও অশিক্ষিত পরিবার থাকিবে না, এবং কোনও পরিবারে এক জনও অশিক্ষিত থাকিবে না।" আমরা দেখিয়াছি, ইহার ২৪ বৎসর পরে, জাপানে, বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত-বয়স্ক বালকবালিকাগণের মধ্যে শতকরা ৯২ জন বিদ্যালয়ে যাইতেছে। ভারতবর্ষের শিক্ষাকার্য্য যখন দেশের লোকের দ্বারা চালিত হইবে, তখন জাপান যাহা করিয়াছে, ভারতবর্ষ কেন তাহা করিতে পারিবে না? কারণ, এ কথাটী ভুলিলে চলিবে না যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আসল গোড়া তাহাদের পিতৃপিতামহের গ্রামে রহিয়াছে, এবং অনেক উকীলের কুটুম্ব রায়ত। জাতিভেদ সত্ত্বেও পাশ্চাত্যদেশ অপেক্ষা এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্মিশ্রণ অনেক বেশী, এবং সহরের ও গ্রামের অধিবাসিগণের মধ্যে সম্বন্ধও বেশ ঘনিষ্ঠ। রায়ত পরিবারের বুদ্ধিমান্ বালক উকীল হয়; যাহার তেমন বুদ্ধি নাই, সে রায়ত থাকিয়া যায়। দেশবাসিগণের মধ্যে পরস্পরের এই যে সজীব সহানুভূতি, জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে তাহা অনেক মন্তব্যে আন্তরিকতার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। যখন আমরা হোমরুল পাইব, তখন এই সমুদয় মন্তব্য কার্য্যে পরিণত হইবে।

(৬) স্থানীয় গভর্মেণ্ট বোর্ড।

স্থানীয় শাসনপদ্ধতির মাথার উপর একটী স্থানীয় গভর্মেণ্ট বোর্ড থাকিবে; ইহার কার্য্যসমূহ প্রাদেশিক মন্ত্রণাসভার আইনের দ্বারা স্পষ্টরূপে বিধিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এই আইন ও এই আইনের সমর্থক অন্যান্য বিধানগুলি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের লোকাল গভর্মেণ্টের আইনের ধরণে হইবে। গত মাসে দিল্লীতে হোমরুল-সমিতিসমূহের আবেদন-পত্রে ইহাই প্রস্তাবিত হইয়াছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের রাজকীয় স্বাস্থ্য-কমিশন যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে বেশ প্রযোজ্য। অবশ্য ঐ মন্তব্য তথাকার বিশেষ অবস্থার অনুরোধে একজন বড় রকমের পরিদর্শক স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীর নিয়োগ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছিল,—

"একজন পদস্থ ও বিশেষ শক্তিশালী মন্ত্রী থাকিবেন; তিনি যে সমুদয় শাসনশক্তি কেন্দ্রস্থ করিবেন, অর্থাৎ নিজের হাতে লইবেন, তাহা নহে। পক্ষান্তরে, তিনি স্থানীয় শাসন-কার্য্যের প্রাণ-শক্তিকে ক্রিয়ান্বিত রাখিবেন—প্রকৃত কেন্দ্রস্থ চালকশক্তির যাহা কার্য্য, ঠিক তাহাই করিবেন। সাহায্যের জন্য, উপদেশের জন্য দেশের যাবতীয় স্থানীয় গভর্মেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই কেন্দ্রশক্তির শরণ লইবেন।"

ইংলণ্ডের স্থানীয় গবর্মেণ্টের চারি দিকে যে সমুদয় অসুবিধা, তাহার বর্ণনায় কমিশনরগণ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মান্দ্রাজের মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি যে নৈরাশ্যপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই স্মরণ হয়।—

জন সাধারণের প্রকৃতিগত জড়তা—এবং তজ্জাত ঔদাসীন্য দূর করা বড়ই দুরূহ। স্বেচ্ছায় নিজের উপর ট্যাক্স বসাইতে সকলেই নারাজ; কাজের বেলায় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর কাহারও বিশ্বাস নাই। স্বাস্থ্য-

বিষয়ক বিধান ভঙ্গ করিয়া যাহারা আনন্দ পায়, তাহাদের সংখ্যা খুব অধিক; এমন কি, যাহারা স্থানীয় ব্যাপারের কর্ত্তা, এবং আইন অনুসারে যাহাতে কাজ হয়, ইহা দেখা যাহাদের কর্ত্তব্য, তাহাদের মধ্যেও অনেকে এই দলের।"

এই সকল বাধা-বিঘ্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভারতপ্রবাসী ইংরাজেরা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দিতে অনিচ্ছুক। এবং এই অজুহাতে অল্প কিছু দিয়া বহুকাল ধরিয়া তাহার পরীক্ষা চালাইতে চাহেন। ইংলণ্ডেও ইংরাজের সম্মুখে এই সমুদয় বাধা বিদ্যমান, অথচ তাঁহারা মনে করেন যে, এই সমুদয় বাধা আছে বলিয়াই, স্থানীয় লোকের স্বায়ত্তশাসনের শক্তিকে সঞ্চালিত করা উচিত। ইংলণ্ডের এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল—"সরকারি একটি বিভাগে সাধারণের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিধি-সমূহ, দরিদ্রগণকে সাহায্যদান ও স্থানীয় গভর্মেণ্টের পরিদর্শন কেন্দ্রীভূত করা।"

অবৈতনিক সদস্যগণের দ্বারা এই বোর্ড গঠিত, তাহারা কিছুই করে না। কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্ট, রাজ্যের সমুদয় সচিবগণ, লর্ড প্রিভি-সিল, প্রধান ধনাধ্যক্ষও ইহার সদস্য। সুতরাং এই বোর্ড খুব সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত। এই বোর্ডের যে কিছু করিবার শক্তি আছে, তাহা বোর্ডের সভাপতি করিয়া থাকেন। তিনি সাধারণতঃ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য ও এক জন মন্ত্রণা-সভার সদস্য। বার্ষিক বেতন ২৬ শত পাউণ্ড। তাঁহার এক জন স্থায়ী সম্পাদক, পাঁচ জন সহকারী সম্পাদক, এক জন ব্যবস্থাপক, এক জন প্রধান পূর্ত্তকার্য্যের পরিদর্শক, এক জন প্রধান চিকিৎসক ও তাঁহার অধীনে অনেকগুলি চিকিৎসক-পরিদর্শক, কয়েক জন স্থপতি, কয়েক জন ইঞ্জিনিয়ার, ও তাহা ছাড়া সরকারী আফিসে সাধারণতঃ যেমন লোকজন থাকে, তাহা আছে। আমরা রাজ্যশাসনের জন্য যে কার্য্যকরী সভার সৃষ্টি করিতে বলিতেছি, তাহার শাসনাধীনে এক জন

ভারতীয় সদস্য যদি স্থানীয় গবর্মেণ্টের সভাপতি হন, আর কেবল শোভাবর্দ্ধনের জন্য যে বোর্ড, তাহা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতেই কাজ হইবে।

বোর্ডের কর্ত্তব্য অনেক প্রকারে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৮৩৫ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পার্লিয়ামেণ্টের ৪১টি বিধানের দ্বারা ও ১৮৭১ হইতে ১৯০৭, এই সময়ের মধ্যে ১৫৪টি বিধানের দ্বারা দরিদ্র-আইনের কমিশনরগণের ও দরিদ্র-আইনের বোর্ডের যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, তাহা ঐ বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। খণ্ডব্যবস্থা, নির্দ্দেশসমূহ, গৌণবিধানসমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার এখন আমার সাহস হইতেছে না। যখন আমাদের বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হইবেন, তখন তিনি সে সমুদয়ের আলোচনা করিবেন।

প্রাদেশিক মন্ত্রণাসভা ও প্রধান মন্ত্রণাসভা।

জাতীয় মহাসমিতির ও নিখিল-ভারতীয় মুসলমান-সমিতির ব্যবস্থাপত্র দেশবাসিগণের সম্মুখে এক বৎসর কাল রহিয়াছে, এবং ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও ভারত-সচিবের নিকট তাহা উপস্থাপিত হইয়াছে। আমি সে সম্বন্ধে এখানে বিচার করিব না; কারণ, গত দুই বৎসর কাল সকল দিক হইতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিচারিত হইয়াছে। আমরা সকলে সরলভাবে ও উৎসাহের সহিত সেই ব্যবস্থার বিচার ও ব্যাখ্যা করিয়াছি, এবং উহার নির্দ্দিষ্ট সীমার অধীন থাকিয়া কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন ও নবীন যুগের যে সন্ধিকাল সেই কালের জন্য ঐ ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছিল। সেই যুগসন্ধিকালে দেশ যাহাতে সেই ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিতে পারে, সে জন্য দেশকে প্রস্তুত করা আমাদের কর্ত্তব্য। ব্যবস্থাপক-সভার ১৯ জন সদস্য যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন, তাহাতে যুদ্ধের পর যে সমুদয়

সংস্কার হওয়া উচিত, তাহারই কথা আছে। জাতীয় মহাসমিতি ও মুসলমান-সমিতির ব্যবস্থাপত্র যুদ্ধকালের এবং তৎপরবর্ত্তি কালের মধ্যে একটি সেতুর মত। অথবা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে, গত বৎসরের জাতীয় মহাসমিতির মন্তব্যে যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সেই অবস্থায় পহুঁছিবার সেতু। জাতীয় মহাসমিতির মন্তব্যের সে অংশ এই :—

"সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনকালে ভারতবর্ষ পরাধীনতার অবস্থা হইতে স্বায়ত্ত-শাসনাধীন রাজ্যসমূহের সহিত সাম্রাজ্যের সকল ব্যাপারে সমান অধিকার পাইবে।" ইহাই এখন আমাদের আসন্ন লক্ষ্য। কন্‌গ্রেসের ব্যবস্থাপত্র যত দিন না স্বীকৃত হইতেছে, ততদিন আমরা ক্রমাগত আন্দোলন করিতে থাকিব। চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবশ্য এই থাকিবে যে, পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্ত-শাসনে ভারতবর্ষের সমস্ত সামন্ত রাজ্যগুলি যথাযোগ্য স্থান পাইবে, এবং সাম্রাজ্যের মহাসভায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণ বসিবেন। এই সমুদয় কথা আমরা ঐ ব্যবস্থাপত্রে বাদ দিয়াছি।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভাগুলি কি করিবেন, এই সাধারণ প্রশ্নের উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, জেলাবোর্ডকে টাকা মঞ্জুর করা তাহাদের অন্যতম কার্য্য হইবে। জেলাবোর্ড আবার তাহাদের অধীন তালুকবোর্ড ও গ্রাম্য-বোর্ডকে টাকা বিতরণ করিবে। মঞ্জুরী টাকা কি ভাবে ব্যবহার হয়, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হইবে না ; তবে যখন খুব সুস্পষ্ট অনিয়মিত কার্য্য ঘটিবে, তখন স্থানীয় গবর্মেণ্টের অধিনায়কের হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত হইবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে যদি প্রকৃত কিছু করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কাজ করিবার ও ভুল করিবার স্বাধীনতাও দিতে হইবে, তবে ঐ ভুল যেন একেবারে সর্ব্বনেশে না হয়।

তাঁহাদের আর একটী প্রধান কার্য্য এই হইবে যে, তাঁহারা সমগ্র প্রদেশে শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিবেন। সাধারণের হিতকর যাহা

কিছু, তাহার পরীক্ষা বিষয়ে জেলা-বোর্ডগুলিকে সাহায্য করিবেন। এইরূপ করিলে একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিবার যে ব্যর্থশ্রম, তাহা নিবারিত হইবে। এই প্রকারে মহীশূর-রাজ্যে 'রাগী'-ধান্য, ইক্ষু, চীনাবাদাম, আরেকা বাদাম, তুলা, এই সকল সম্বন্ধে যে পরীক্ষাগুলি হইয়াছে, তাহা সমস্ত রাজ্যেরই উপকারে লাগিয়াছে। বড় ও ছোট কল, দধিমন্থনাদি, লাঙ্গল-চালন, বীজ-সাজান প্রভৃতি ব্যাপারের প্রদর্শনী-কার্য্য প্রাদেশিক কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক চালিত হইলেই সম্ভবতঃ ভাল হইবে। তালের চিনি প্রস্তুত করিবার ও পশুদেহোদ্ভূত সার রক্ষা করিবার উন্নত পদ্ধতিসমূহের প্রদর্শনীও তাহাদের দ্বারা হইলে ভাল হয়। মহীশূরে এই সমুদয় পরীক্ষা দেখিবার জন্য বহুসংখ্যক রায়তের সমাগম হইত। বক্তৃতা ও চলিত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ-বিতরণ-কার্য্যও সেখানে হইত। ছয় প্রকারের নূতন লাঙ্গল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং ভাড়ায় খরিদ পদ্ধতিতে বিক্রীত হইয়াছিল। ধাতুদ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ, ছত্রক-তত্ত্ব ও কীটতত্ত্ববিষয়ক গবেষণাও সুসজ্জিত কেন্দ্রস্থ পরীক্ষাগারের দ্বারাই উৎকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠিত হয়। অভিজ্ঞতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিভাগের স্বরূপ নির্ণীত হইবে। মহীশূররাজ্যে রায়তগণ এই সকল উপদেশ সাগ্রহে শুনিতেছে, রিপোর্টে ইহা পড়িয়া খুব আনন্দ হয়।

একটী ভারতবর্ষীয় রাজ্যে ভারতীয়গণ তাহাদের স্বদেশবাসিগণের জন্য কি করিয়াছে, তাহা জানাইবার জন্যই আমি এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। যাহারা শঙ্কিত, ইহা হইতে তাহারা সান্ত্বনা পাইবে, এবং বুঝিতে পারিবে যে, হোমরুল বলিতে সমৃদ্ধি বুঝায়, দুর্দ্দৈব নহে।

কিস্তিবন্দী স্বায়ত্তশাসন।

সম্প্রতি দেশে এক নূতন ভুঁইফোঁড় ব্যবস্থাপ্রসঙ্গ গজাইয়া উঠিয়াছে।

এজন্য পূর্ব্ব হইতে ইঙ্গভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে বেশ যত্নপূর্ব্বক প্রাথমিক আভাস দেওয়া হইতেছিল। ইহা পর্য্যায়ক্রমিক বা কিস্তিবন্দী স্বায়ত্তশাসন নামে পরিচিত। ইউরোপীয়গণ সাগ্রহে ইহার সমর্থন করিতেছেন।

এই ব্যবস্থাপ্রণালী দুই দল কর্ত্তা খাড়া করিতে চায়। এক দল এখন যেমন আছে, ঠিক সেইরূপ হইবে; অর্থাৎ, দেশের লোকের নিকট তাহাদের দায়িত্ব থাকিবে না। টাকাকড়ির উপর অর্থাৎ রাজ্যসংক্রান্ত বিধান সম্বন্ধে ব্যয় নির্দ্দেশ সামর্থ্যের উপর তাহাদেরই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। আর এক দল হইবে দায়িত্ব-সম্পন্ন,—মন্ত্রণাসভার প্রাণশূন্য ছায়াদেহের মত। তাহারা মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইবে, সরকারের এক বা ততোধিক বিভাগ শাসন করিবে, এবং আসল গভর্মেণ্ট যদি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে ক্রমে অধিক ক্ষমতা পাইবে; আর সরকার যদি অপছন্দ করেন, তাহা হইলে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার মত আবশ্যক বিভাগ তাঁহাদের হাতে দিয়া, তাহাদের পরাজয় যাহাতে নিশ্চিত হয়, আসল গভর্মেণ্ট তাহার ব্যবস্থা সহজেই করিতে পারেন। কারণ, এই দুই বিভাগে খুব বেশী টাকার দরকার। এই দুই বিভাগের ভার দিয়া আসল গভর্মেণ্ট বলিবেন যে, সরকারের এখন টাকার খুব দরকার, সুতরাং তোমরা বেশী টাকা মঞ্জুরী পাইবে না। টাকা না পাইলে কাজ ভাল হইবে না; তখন এই দায়ী কর্ত্তার দলকে অযোগ্য বলিয়া ধিক্কার দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া চলিবে। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের শিক্ষা মনে রাখিতে হইবে—কারণ, তাহাও এই প্রকারের ব্যবস্থার একটা পরীক্ষা। নূতন ব্যবস্থায় আসল গভর্মেণ্ট যে স্থান অধিকার করিবেন, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় সরকারী কর্ম্মচারিগণও ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অথবা, আসল গবর্মেণ্ট এই দায়ী কর্ত্তাদিগকে গৌণ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক বিভাগগুলির ভার দিয়া, তাহাতে

তাহাদের কাঁচা হাত পাকাইতে বলিতে পারেন। কাজেই যদি তাহারা বিফল হয়, তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, এবং দেশ তাহাদের প্রতি উদাসীন হইয়াই থাকিবে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরও অনেক আপত্তি আছে। রুটী চাহিলে যেমন পাথর দেওয়া, ইহা ঠিক তেমনি। মূল আপত্তিটা এই যে, যখন ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসন চাহিতেছে, তখন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাধীন করিয়া রাখা হইবে। ভারতবাসিগণের শক্তির উপর আমলা-তন্ত্রের যে স্বভাবসিদ্ধ গভীর অবিশ্বাস, ইহার মধ্যে তাহাই নিহিত—ইহার মধ্যে আরও ভয়ানক স্পর্দ্ধা এই রহিয়াছে যে, ভারতবর্ষকে শিশুর মত হাত ধরিয়া হাঁটি-হাঁটি পা-পা করিয়া চলিতে বলা হইতেছে। কারণ, অন্য এক জাতি চাহিতেছে যে, সে ভারতবর্ষ শাসন করিবে, এবং তাহার সুসজ্জিত ভোজনপাত্র হইতে যখন খুসী তখন স্বাধীনতার 'গুঁড়া নাড়া' তাহাকে ফেলিয়া দিবে। ইংলণ্ড ও সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ সমুদয় জগতের সম্মুখে যে সমুদয় নীতির ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা তাহার প্রত্যেক নীতির বিরুদ্ধ। জাতীয় মহাসমিতি একটি সুনির্দ্দিষ্ট সংস্কারের ব্যবস্থা চাহিয়াছে—তাহার যাহা আসল তথ্য, তাহা স্বীকৃত না হইলে কংগ্রেস কিছুতেই নিরস্ত হইতে পারে না। আমরা আরও অধিক চাহিতে পারি, কিন্তু ইহা অপেক্ষা কম চাহিতে পারি না। স্বাধীনতার সংগ্রামে জাতিসমূহ ক্রমশঃ অগ্রসরই হয়, কখনই পিছু হটে না।

প্রতিনিধি-প্রেরণ।

আমার মনে হয়, আপনাদের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে আইনের প্রস্তাব উঠিলে তদ্বিষয়ে আলোচনার জন্য আপনারা ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন; তাহা হইলে তাঁহাদের উপর এইরূপ আদেশ দিবেন যে, তাঁহারা যেন মূল

সূত্রগুলি অটলভাবে ধরিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রধান ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যের বিশিষ্ট সংখ্যাধিক্য এবং রাজকোষের উপর প্রভুত্ব বিষয়ে তাঁহারা যেন অটল থাকেন। এই দুইটী ক্ষমতা যদি না দেওয়া হয়, তবে প্রস্তাবিত সংস্কারের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন হইবে। যদি এই দুইটা দেওয়া হয়, তবে অবান্তর বিষয়ে যুক্তিতর্ক চলিতে পারে।

যদি এই জন্য প্রতিনিধিবর্গ প্রেরিত হন, তাহা হইলে, আমরা এখান হইতে তাঁহাদের সমর্থন করিবার জন্য খুব জোরে আন্দোলন করিব। এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইংলণ্ডেই সংগ্রাম করিতে হইবে। আমাদের যাহা দাবী, তাহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ইংলণ্ডের সম্মুখে ধরিতে হইবে, এই অর্থে ইহা সত্য। কিন্তু প্রকৃত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হইবে এইখানে; কারণ, ভারতবর্ষ দৃঢ়ভাবে যাহা দাবী করিবে, ইংলণ্ড আইন প্রণয়ন করিয়া সেইটুকু মাত্র দিবে। শক্তিশালী শ্রমজীবি-সম্প্রদায় তাঁহাদের সম্মতিসূচক ভোট দিয়া আমাদের সাহায্য করিবেন। আমরা যে স্বাধীনতা-লাভের জন্য কৃতসংকল্প, এইখানেই আমাদিগকে আমাদের কার্য্য দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

দেশীয় ভাষা।

যে নূতন শক্তি দেশের লোকের হাতে দেওয়া হইবে, যাহাতে সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইতে পারে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষরূপ সাহায্য না করিলে চলিবে না। সে জন্য প্রত্যেক প্রদেশের যাহা কথিত ভাষা, তাহাতে কাজ চালাইতে হইবে। কারণ, তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যেই তাহাদের হৃদয়ে অনুভূতি ও মস্তিষ্কে চিন্তার সঞ্চার সম্ভব।

শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, অবশ্য শীঘ্রই বাঞ্ছনীয়, সমস্ত প্রদেশ-গুলির সীমা কথিত ভাষার হিসাবে পুনর্গঠন করিতে হইবে। রাজ-কার্য্যের ভাষা কিছুদিনের জন্য ইংরাজী ও প্রাদেশিক ভাষা এই উভয়ই থাকিবে;—যেমন কানাডার কোনও কোনও অংশে ফরাসী ও ইংরাজী উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলেই সমুদয় লোক জাতীয় সাধারণ জীবনে তাহাদের ভাগ পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারিবে।

আসন্ন লক্ষ্য।

আমাদের আসন্ন লক্ষ্য কি হইবে? জাতীয় মহা-সমিতির গতবর্ষের মন্তব্যের তৃতীয় অংশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমাদিগকে একটা কার্য্যপদ্ধতির নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কেবলমাত্র ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষের জন্যই আমরা তাহা করিতে পারি। (১) ভারতীয় দেশীয় সামন্ত রাজ্য-সমূহের স্থান কিরূপ হইবে, তাহা দেশীয় রাজন্যগণের সহিত ইংরাজ গভর্মেণ্টের যে সমস্ত সন্ধি আছে, তাহার সর্ত্তগুলির বিচার করিয়া গ্রেটব্রিটেন স্থির করিবেন। ইংরাজ-শাসিত-ভারতবর্ষ-সক্রান্ত আলোচনায় আমাদিগকে ইহাই দেখিতে হইবে যে, যে সমস্ত রাজা স্বীয় রাজ্যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, অথবা যাঁহার রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি ব্রিটিশ-ভারতে প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার অনুরূপ নহে, এমন কোনও সামন্তরাজ আমাদের মন্ত্রণাসভায় সমাগত হইয়া যেন মত প্রকাশ করিবার অধিকার না পান। কোনও দেশীয় রাজা ব্রিটিশ-ভারতে এমন কোনও কর্ত্তৃত্ব পাইবেন না, যাহা তাঁহার রাজ্যের উপর ব্রিটিশ-ভারতের নাই। (২) কেন্দ্রীকৃত সাম্রাজ্যশক্তি যাহার হস্তেই থাকুক, তাহাতে ভারতবর্ষের এমন একটি স্থান থাকিবে, যাহা ভারতবর্ষের প্রকৃত গৌরবের অনুরূপ। কারণ, তাহা না হইলে সাম্রাজ্যগত ব্যাপারে ভারতবর্ষ গ্রেট-ব্রিটেন ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক

রাজ্যসমূহের দ্বারা শাসিত একটি আবাদে পরিণত হইতে পারে, তাহার শিল্পোন্নতির আশা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এখন যেমন প্রস্তাব করা হইতেছে, তদনুসারে যদি এই সমর-পরিষৎ ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব-সভায় পরিণত হয়, তাহা হইলে ইহার অধিকার কেবলমাত্র সাম্রাজ্যের রক্ষাকার্য্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। যে সমুদয় স্বায়ত্ত-শাসনাধীন জাতির দ্বারা এই সাম্রাজ্য গঠিত, সেই সমুদয় জাতির নিকট প্রথম উপস্থাপিত না করিয়া অন্যপ্রকারের কোনও প্রশ্ন সেখানে উপস্থাপিত হইতে পারিবে না—যদি কোনও জাতি কোন বিষয় উত্থাপনে আপত্তি করে, তাহা হইলে সে বিষয় বাদ দিতে হইবে। প্রত্যেক জাতি নিজের শুল্কগত ও রাজস্ববিষয়ক ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীন অধিকার ভোগ করিবে। এখন যেমন উপনিবেশসমূহের আছে, সেইরূপ হইবে। তবে সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য তাহাদিগকে খরচ দিতে হইবে।

ভারতসচিব মন্‌টেগু সাহেব যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তখন এই সময় সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের কি দাবি, তাহা বলা উচিত; কারণ বুঝা গিয়াছে, ভারত-শাসন-সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের উদ্‌যোগ চলিতেছে—এই সময় বনার ল সাহেবের উপদেশ স্মরণ করিয়া খোলা তপ্ত থাকিতে থাকিতে পাক চড়ান উচিত।

আমাদের আসন্ন লক্ষ্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা বৃটিশ গভর্মেণ্টকে প্রার্থনা করি যে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পার্‌লামেণ্ট অষ্ট্রেলিয়া সাধারণ-তন্ত্রের ধরণে ভারতবর্ষে স্বরাজ্ প্রতিষ্ঠা করিয়া একটা আইন পাশ করুন—তাহাতে যেন এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে—একান্ত না হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বে ঐ আইন আমলে আসিবে। মধ্যবর্ত্তী এই পাঁচ বা দশ বৎসরে ইংলণ্ডের সহিত সংস্রব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া (যেমন উপনিবেশ সমূহে আছে), শাসনশক্তি ইংরেজের হস্ত হইতে ক্রমে ক্রমে ভারতবাসীর হস্তে হস্তান্তরিত করা হইবে।

এই হস্তান্তর কার্য্য একটা নির্দ্দিষ্ট ক্রমে সম্পন্ন হইবে। প্রথমতঃ কন্‌গ্রেস ও মোসলেম-লিগের অনুমোদিত সংস্কার প্রণালীর অনুরূপ কোন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া ভোট দিবার অধিকার বিস্তৃত করিতে হইবে। ঐ প্রণালীর আসল কথা এই যে কার্য্যকরী সমিতির একার্দ্ধ ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণের ভোট দ্বারা নিযুক্ত করা হইবে, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের রাজকোষের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকিবে, এবং কি প্রাদেশিক কি সার্ব্বদেশিক—সর্ব্বত্র ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদিগের সংখ্যাধিক্য থাকিবে।

আমরা প্রথমে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন অধিকার চাহিয়াছিলাম—ইহাতে নাকি প্রভুত্ব না হইলেও প্রভাব হয়। কিন্তু কার্য্যে দেখা গেল উহা অকিঞ্চিৎকর। এখন আমরা ভারতশাসন কার্য্যের অংশীদার হইতে চাই। গবর্মেণ্টের সভাভঞ্জন (dissolution) ও 'ভিটো'র (veto) ক্ষমতা থাকিবে; আর প্রকৃতিপুঞ্জের রাজকোষের উপর অধিকার থাকিবে। ইহাই দ্বিতীয় ক্রম—দুই সমকক্ষ পক্ষের সাজিদারি ও সহযোগিতা। তৃতীয় ক্রম হইবে পূর্ণাঙ্গ হোমরুল বা স্বরাজ—১৯২৩ বা ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা স্বতই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের এই প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিবার সম্বন্ধে আমরা মোসলেম-লীগের নিকট বিশিষ্ট সাহায্যের প্রত্যাশা করি।

প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি এইরূপ হইবে,—

(১) সমস্ত ব্যবস্থাপক-সভার সমুদয় সদস্য নির্ব্বাচিত সদস্য হইবেন।

(২) যাঁহারা সরকারী কাজ করেন, তাঁহারা নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন কিন্তু নির্ব্বাচনের প্রার্থী হইতে পারিবেন না; যত দিন তাঁহারা লাভজনক সরকারী পদে নিযুক্ত থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা কোনও রাজনৈতিক বাদানুবাদে যোগ দিতে পারিবেন না। অবশ্য, যাঁহারা পেন্সন-

প্রাপ্ত ও অবসর-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী, তাঁহারা এই নিষেধ-বিধির অধীন থাকিবেন না।

(৩) প্রধান ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভাসমূহে একটিমাত্র 'চেম্বার' থাকিবে।

(৪) রাজা যেমন তাঁহার স্বকীয় অধিকারে প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্য-নিয়োগ করেন, বড়লাট ও ছোটলাট নিয়োগ করেন, এবং অধিকার প্রয়োগকালে রাজ্যের যিনি প্রধান সচিব, তাঁহার অনুমোদনে কাজ করেন, সেইরূপ রাজা সদস্য-সভার এক জনকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আদেশ করিবেন—এই মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সভ্য প্রিভি-কাউন্সিলের সভ্যগণের ন্যায় প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ সভ্য হইবেন, কিন্তু তাঁহারা মন্ত্রিগোষ্ঠী-রূপে সাধারণ ব্যবস্থাপক-সভার নিকট দায়ী থাকিবেন, এবং সেই সাধারণ ব্যবস্থাপক-সভায় যদি তাঁহাদের উপর বিশ্বাস নাই, এই ভাবের মন্তব্য গৃহীত হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্রিগোষ্ঠী পরিবর্ত্তিত হইবে।

(৫) ভারতবর্ষ-রক্ষার জন্য সৈন্যদল ও নৌবিভাগ, সম্রাটের প্রতিনিধি বলিয়া বড়লাটের অধীন থাকিবে, এবং ভারতবর্ষের কর হইতে তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য ভারতবর্ষকে কি দিতে হইবে, তাহা সমর-পরিষৎ ও ভারত সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

(৬) বাণিজ্যার্থ নৌবিভাগের গঠন, নিয়ন্ত্রন, ও আনুকূল্যদানের ভার ভারত গবর্মেণ্টের হস্তে থাকিবে, এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যুদ্ধের পর সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইবে। (৩) (৪) (৫) মন্তব্য সম্বন্ধে আমি আরও বলিতে চাহি যে—

(৩) প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইবে। কিন্তু ইহা না বুঝিলে চলিবে না যে, ভারতবর্ষে স্বার্থের ও মতের যেরূপ বৈচিত্র্য,

তাহাতে তাড়াতাড়ি আইন-প্রণয়ণ, যে সম্বন্ধে কেবল বাধা দান দ্বিতীয় মন্ত্রণা-সভার কার্য্য, তাহার সম্ভাবনা নাই। গভর্ণর কর্ত্তৃক সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অধিকার এবং কোনও ব্যবস্থা 'ভিটো' করিবার অধিকার ভারতের মত স্থিতিশীল দেশে যথেষ্ট সংযমনের কার্য্য করিবে।

(৪) ইংলণ্ডে ক্যাবিনেটের কোনরূপ বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত ভিত্তি নাই। রাজা মন্ত্রি-গোষ্ঠীর সহযোগে অর্থাৎ রাজা ও তাঁহার প্রিভি-কাউন্সিলারগণ রাজ্যশাসন করেন। দ্বিতীয় জর্জ্জ ইংরাজী ভাষা জানিতেন না; কাজেই তিনি কাউন্সিলের সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন হইতে মন্ত্রি-গোষ্ঠীর ক্ষমতার প্রসার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যকে প্রিভি-কাউন্সিলারের উচিত শপথ লইতে হয়। মন্ত্রিত্ব শেষ হইয়া গেলেও মন্ত্রিগণ প্রিভি-কাউন্সিলার থাকেন; যখন রাজ্যসংক্রান্ত বিশিষ্ট বিষয়ের আলোচনা হয়, কেবল-মাত্র সেই সময়ে মন্ত্রণাসভায় আহূত হন। রাজার অধিকারকে আমাদের অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে; অথচ মন্ত্রিগণ যাহাতে এদেশের সাধারণ ব্যবস্থাপক-সভার নিকট দায়ী থাকেন, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) প্রস্তাবোক্ত "ভারতীয় সৈন্যে"র অর্থ,—ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের দ্বারা পুষ্ট ও গঠিত সৈন্যদল। ইহার নায়কগণও ভারতবর্ষের লোক হইবেন। ইংরাজ সৈন্য তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে। তাহা হইলে, ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড অর্থব্যয়ের দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবে। এখন বিদেশী সৈন্য অল্পদিন কাজ করিয়া বিলাতে ফেরত যায়; তাহাদের যাতায়াতের খরচ যোগাইতে হয়, বিলাতে ডিপো রাখিতে হয়, এবং সৈন্য-সংগ্রহাদির জন্য অনেক ব্যয় করিতে হয়। ভারতীয় সেনা প্রাদেশিক টেরিটোরিয়াল ও বৃহৎ রিজার্ভের দ্বারা গঠিত হইবে।

ভারত-সচিব।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ চিরদিন ভারত ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর হইয়া থাকিবে, কারণ এই বৎসরে ভারত সম্বন্ধে ইংলণ্ডের শাসননীতির হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন এত দ্রুতগতিতে হইয়াছে যে, ইহার দ্রুততায় বিস্মিত হইতে হয়। কারণ আমরা—যাহারা এই পরিবর্ত্তনের জন্য প্রযত্ন করিয়াছি—আমরাও ইহাতে বিস্মিত হইয়াছি। বিগত ২০শে আগষ্ট গত বৎসরের কন্‌গ্রেসের প্রথম দাবি—দৃশ্যতঃ না হইলেও স্বরূপতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা চাহিয়াছিলাম যে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সমন্বিত একটি রাজকীয় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হউক, কারণ ঐরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করিলে বেশ সুশোভন ও চিত্তাকর্ষক হইবে এবং আমাদের সম্রাট আরও জনপ্রিয় হইবেন। তৎপরিবর্ত্তে বিলাতের মন্ত্রিসভা রাজকীয় অনুজ্ঞার ঘোষণারূপে রাজাদেশ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন।

ইংলণ্ড হইতে পরম মান্যবর ভারত-রাষ্ট্রসচিব অন্যান্য খ্যাতনামা রাজনীতিজ্ঞের সহিত ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার শুভাগমনের কি ফল হইবে এখনও বলা যায় না। তবে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শ্রীযুক্ত বড়লাট ও ভারত-সচিব উভয়েই ভারতের প্রতিনিধিবর্গের বক্তব্য মিত্রভাবে ধৈর্য্যের সহিত শুনিতেছেন। বর্ত্তমান আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া কোন লোকমতকে প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধি এবং আমার বক্তব্যও আমরা সম্পূর্ণ বলিতে পাইয়াছি। কংগ্রেস ও মোসলেম-লীগের প্রধান সদস্যদিগকেও ঐরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। হোমরুল-লীগের সম্বন্ধেও বেশ সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ দেবতার হস্তে। পূর্ব্বাবধি যাঁহাদের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত আছে, তাঁহারা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছেন।

ইহাদের প্রভাব আমাদের অবিদিত নাই। কিন্তু ভগবানের ন্যায়-বিচারে আমরা বিশ্বাস করি। আরও বিশ্বাস করি যে, যে সকল ইংরাজ তাঁহাদের স্বদেশের চিরন্তন ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের পক্ষাবলম্বন করিবেন। ইংলণ্ডের শ্রমজীবি-সমবায় কংগ্রেস ও হোমরুল লীগের সহিত যে ভ্রাতৃভাবে প্রতিনিধি বিনিময় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৃটিশ ও ভারতীয় গণতন্ত্রের নবজাত ভ্রাতৃত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। হোমরুল-লীগ্ আগামী মাসের বার্ষিক শ্রমজীবি-সম্মিলনে মিষ্টার ব্যাপ্‌টিষ্টাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন এবং শ্রমজীবি-সমবায়ের প্রতিনিধি হইয়া মেজর গ্রেহাম পোল্ এদেশে আসিয়াছেন। আমি আশা করি যে কংগ্রেস ও শ্রমজীবি-সম্মিলনে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইবেন এবং সমবায়ের প্রতিনিধিকে সাদর-সম্ভাষণ করিবেন। এইরূপে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে গ্রন্থি রচিত হইবে, তাহাতে উভয়ের মিলন ঘনিষ্ঠতর হইবে। এইজন্য এবং ভারত-সচিবের ভারত-আগমন জন্য ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ একটি গণনীয় বৎসর হইল।

অন্তরীণে আবদ্ধ ভ্রাতৃগণ।

এই উপলক্ষে মুসলমান জননায়ক মহম্মদআলী ও সৌকত আলীর অনির্মুক্তিতে আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। সুদীর্ঘ সওয়া তিন বৎসর কাল তাঁহাদের রাজনীতিক জীবন স্তম্ভিত রহিয়াছে—এবং অন্তরীণে তাঁহারা জীবনে মরণ অনুভব করিতেছেন। তেজস্বী, স্বদেশী-প্রেমিকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গ্লানিকর ও অপমানজনক দণ্ড হইতেই পারে না। যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, তাঁহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তাহা হইলেও সেই অপরাধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আমরা তাঁহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তাঁহাদের স্বধর্ম্মে আস্থার জন্য তাঁহাদিগকে

সম্মান করি। আমরা অদ্য তাঁহাদের পদপ্রান্তে আমাদের ভক্তিপূর্ণ সম্বর্দ্ধনা উপহার দিতেছি। আমরা নিশ্চয়ই জানি যে, যখন তাঁহারা কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমগ্রজাতির পূজা পাইবেন, তখন তাঁহাদের এই দীর্ঘকালব্যাপী যন্ত্রণাভোগ নব অভ্যুদয়ের শক্তির আকারে পরিণতি পাইবে।

আমাদের দলাদলি।

ভারতবর্ষের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির প্রতি যাঁহারা দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আমাদের রাজনীতিক সংঘ-বদ্ধ কার্য্যসমূহে আত্মগত ভেদসাধনের প্রবৃত্তি খুব বেশী। বিপক্ষদল আমাদিগকে প্রজাতন্ত্রমূলক স্বাধীনতা না দিবার ইহাকেই হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে, এই আত্মভেদ হয় বলিয়াই প্রজাতন্ত্রমূলক স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। অনেকের নিকট এ উক্তি প্রহেলিকার মত মনে হইতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

আমাদের জাতির মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, এবং অনেক প্রকারের মত আছে। আমরা স্বাধীনতা-লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি। আমাদের এই জাতির মাথার উপর এক সরকার আছেন; সমস্ত ক্ষমতা ও সমুদয় প্রভুত্ব তাঁহার অধিকৃত; এই সরকার, যাহাকে অতিরিক্ত পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী বলিয়া বিবেচনা করেন, শাসনবিভাগের হুকুমের জোরে তাহাকে চূর্ণ করিতে পারেন। যে সকল বিধানে সরকারের এই শক্তি খর্ব্ব হইতে পারে, সেই সমস্ত বিধানকে ব্যর্থ করিবার জন্য যে দল বা যে লোক সাহায্য করিতে প্রস্তুত, সরকার সেই দলকে বা সেই লোককেই আপনার করিয়া লন। দলাদলির কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে কি না, সরকার তাহা স্বভাবতঃ পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং সেই লক্ষণ দেখিতে পাইলেই দুর্ব্বলকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া সবলকে দমন করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

যে ব্যাপারটাকে "ভারত-বিজয়" বলিত, সে ব্যাপারটাও এই ভাবেই সাধিত হইয়াছিল। লর্ড লিটন যখন ভারতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, তখন একটী সঙ্কল্পিত যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট এইরূপ আদেশ আসিয়াছিল,—"যুদ্ধের যদি কোনও উপলক্ষ্য নাই থাকে, তাহা হইলে তুমি অবশ্য অবশ্য একটা গড়িয়া তুলিবে।" সেইরূপ যদি দলাদলির কোন লক্ষণ নাও থাকে, তাহা হইলে একটা গড়িয়া তোলা হয়। দাদাভাই নৌরোজীকে যখন ইংলণ্ডের মহাসভায় প্রেরণ করা হয়, তখনও এইরূপ কৌশল অনুসৃত হইয়াছিল। মিষ্টার ভাবনাগরীকে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড় করান হইল, এবং এক জন প্রতি-ক্রিয়াপরায়ণের দ্বারা এক জন তেজস্বী সংস্কারকামীকে সরাইয়া দেওয়া হইল। রাজনীতিক অবস্থা ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর অস্বাস্থ্যকর হইতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা ধরুন। স্বভাবতঃই আমাদের জাতির মধ্যে ইহারা দুইটি স্বাভাবিক দল, তাহাদের উভয়ের উপরে যে সরকার আছেন, তিনি খৃষ্টান। তিনি তৃতীয় দল। দুই দলই তৃতীয় পক্ষের কৃপালাভের জন্য প্রতিযোগিতা করে। এই জন্যই হিন্দু মুসলমানে দলাদলি দাঙ্গা ইত্যাদি। কিন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহে, যেখানে শাসনকর্ত্তা হয় হিন্দু, না হয় মুসলমান, এবং তাঁহাকে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই শাসন করিতে হয়, সেখানে এরূপ হয় না। এই জন্যই কলিকাতায় ও লক্ষ্ণৌএ হিন্দু মুসলমানে বহু বিতর্কের পর যে সখ্যের ঐক্য হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য এত চেষ্টা।

সমাজের মধ্যে যাঁহারা অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী, তাঁহারা সংঘ-বদ্ধ হইয়া যে সকল রাজনীতিক মীমাংসায় উপনীত হয়েন যাঁহারা সেই সকল সিদ্ধান্ত দ্বারা আপনাদিগকে বাধ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না, এ প্রকারের কতক লোক প্রত্যেক সমাজে চিরদিনই থাকিবে, এবং এই লোকগুলি

উৎকোচের লোভে বা ভয়ের তাড়নায় সরকারের কার্য্যের সমর্থনের জন্য একদল বিশৃঙ্খল ও দায়িত্বহীন লোক সংগ্রহ করিয়া দিবে। (ঐ যে উৎকোচ বা ভয়, বেসরকারি হইলেও তাহা সরকারী লোকের দ্বারা প্রণোদিত)। এইরূপ করিয়া লোকগুলি সাম্প্রদায়িক পৃথক ও বিশেষ সুবিধা পাইবার আশা করে।

এই প্রকারে মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণবিরোধী দলের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের কয়েক শত লোক লইয়া একটা সভা আছে, আর তিনখানি খবরের কাগজ আছে। সে যাহা হউক, বিচক্ষণ নেতা দেওয়ান বাহাদুর কেশব পিলাই-এর নেতৃত্বাধীনে একটি খাঁটী অব্রাহ্মণ-সভার উদ্ভব হওয়ায় এই সভা মলিন হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত সভার কয়েক সহস্র অনুরাগী সভ্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলনের উদ্দেশ্য, বড় বড় সরকারী চাকুরী যোগাড় করা। তাহারা আশা করে যে, 'হোমরুল' আন্দোলনের নিন্দা ও সরকার বাহাদুরের প্রশংসা দ্বারা, তাহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারিবে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এইরূপ আরও আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে— হোমরুল-কুকুরকে মারিবার জন্য যে কোন প্রকারের লাঠিই প্রশস্ত।

এই সমস্ত দলাদলি দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইবার কোনও কারণ নাই। যত দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ দায়িত্বহীন শাসন-যন্ত্রের অধীন থাকিবে, তত দিন এ প্রকারের দলাদলি বায়স্কোপের ছবির মত আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতে থাকিবে।

যখন বিজাতীয় তৃতীয় পক্ষের উপর শাসনের কর্ত্তৃত্বভার থাকিবে না, তখন জাতীয় সম্প্রদায়গুলি তাহাদের লক্ষ্যের পার্থক্য সত্ত্বেও সমগ্র রাজনীতিক শরীরের সুস্থ অঙ্গ-রূপে সংহত হইয়া যাইবে। শক্তির ব্যবহার করিতে পাইলে একটা দায়িত্ববোধ জন্মিবে; এবং দায়িত্ব হইতে সুবিবেচিত সংযম জন্মিবে।

যুগসন্ধিকালের এই সকল গোলযোগ ও কলহকে আমরা খুব বড় করিয়া দেখি, এবং তাহার ক্ষতি করিবার প্রকৃত ক্ষমতা অপেক্ষা সে সকলকে অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে করি। আমরা 'হোমরুল' লাভ করিলে এগুলি তাহাদের যথাযোগ্য রূপ ধারণ করিবে।

খণ্ড সংস্কার।

জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় খণ্ড সংস্কারের দাবী করিয়াছে, আমি আর সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিব না। তাহাদের মধ্যে যেগুলি বেশী প্রয়োজনীয়, সেগুলির একটি পৃথক্ তালিকা প্রদত্ত হইবে। জাতীয় মহাসমিতির নেতৃগণের মধ্যে অধিকাংশই একই দাবী পুনঃ পুনঃ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং এখন অনুভব করিতেছেন যে, 'হোমরুলে'র উপরই সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করা উচিত। কারণ, একবার দেশের লোক শক্তিলাভ করিলেই তাহারা অপকৃষ্ট আইনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, এবং ভাল আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভা জাতীয় মহাসমিতির মন্তব্যগুলি গ্রহণ করিবে, এবং দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনানুসারে যেগুলি যেভাবে প্রযোজ্য, সেই ভাবে আইন করিবে। স্বাধীন ভারতবর্ষ শাসন ও বিচার-বিভাগ পৃথক করিবে, রাজস্ব-সংগ্রাহক, বিচার ও পুলিস কর্ম্মচারিগণকে স্বতন্ত্র করিবে, এবং নিম্নআদালতকে শাসনবিভাগের অধীন না রাখিয়া হাইকোর্টের অধীন করিবে—শিক্ষা-আইন প্রবর্ত্তিত করিবে, সর্ব্বত্র জুরীর বিচার প্রচলিত করিবে—বিদেশপ্রবাসী ও বিদেশে উপনিবিষ্ট ভারতবাসিগণকে রক্ষা করিবে, জমী-বন্দোবস্তের বেশ সাম্যমূলক সুব্যবস্থা করিবে, ভারতের শ্রমশিল্পের শৃঙ্খলাসাধন ও উন্নতিবিধান করিবে, কর্ম্মচারি নিয়োগের

জন্য এদেশেই পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিবে, শাসনপ্রথা এমন ভাবে পুনর্গঠিত করিবে, যাহাতে ভবিষ্যতে আর জাতিতে জাতিতে বৈষম্য থাকিবে না ; সামরিক কলেজ করিয়া, ভারতসন্তানগণ যাহাতে সম্রাটের কমিশন পায়, তজ্জন্য সুশিক্ষা দান করিবে।

বৈধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যত বিশেষ আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,—যে সমুদয় লেখা ও বক্তৃতা কোনরূপ অপরাধের প্ররোচনা করে না, বা কোনরূপে মানহানির আইনও লঙ্ঘন করে না, এমন সমস্ত রচনা ও বক্তৃতা যে সব আইনের দ্বারা দলন করা হইতেছে, সে সমুদয় সভ্যদেশের অনুপযুক্ত বলিয়া একেবারে উঠাইয়া দিবে। শাসন-কর্ত্তারা বিচার না করিয়া কেবল গুপ্ত-পুলিসের অভিযোগ ও সন্দেহ মূলে এখন যেমন কারারুদ্ধ করিতে, দেশান্তরিত করিতে, বৃত্তি শূন্য করিতে, অন্তরীণ করিতে, দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন, তখন তাঁহাদের সেরূপ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। নিজের অপরাধ কি জানে না, এমন লোক ক্লেশভোগ করিবে না ; প্রকাশ্য বিচার ও আত্মসমর্থনের সুযোগ ব্যতীত কাহারও স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া হইবে না। শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রচারকার্য্য, শোভা-যাত্রা, পতাকা, সভা প্রভৃতিতে ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিস-কর্ম্মচারী হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। মোটকথা, মাগ্না‌কার্টা ও বিল্-অব্-রাইটস্-এর দ্বারা মানবের যে সাধারণ ও প্রাথমিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার তাহা ভোগ করিতে পারিবে।

স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানব এবং অন্যান্য সভ্যদেশের মানবের সমকক্ষ হইবার কি আনন্দ, তাহা চিন্তা করুন। দমন-নীতির বিষবায়ুনির্মুক্ত ভারতের বায়ুসেবন কি আনন্দের, তাহা চিন্তা করুন। প্রকাশ্য বিচার ব্যতীত ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় ও সম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না,

মনুষ্যসুলভ এই অধিকারের অনুভূতিতে কি আনন্দ! নিজে জানিলাম না, অথচ রহস্যের অন্ধকারে আবৃত এক শাসনশক্তির খেয়ালের ফলে অপরাধী হইলাম, এমন আর ঘটিবে না, তাহাতে কি আনন্দ! কেবল আইনের দ্বারাই দেশ শাসিত হইতেছে, শাসনকর্ত্তাগণের স্বেচ্ছামাত্রে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, এমন দেশে সভ্যমানবের সাধারণ অধিকার-উপভোগের কি আনন্দ! কেবল হোমরুলের দ্বারাই এমন নিরাপদ ভাব আসিতে পারে।

উপসংহার।

প্রতিনিধি ভ্রাতৃগণ! আপনাদের সম্মুখে নানা কথা কহিয়া আপনাদের অনেকটা সময় ব্যয় করিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। এই জাতীয় মহা-সমিতির সভাপতির আসন জীবনে কেবল একবারমাত্র অধিকার করিতে পারা যায়, এবং যে দেশকে আমরা সকলে এত ভালবাসি, সেই দেশ সম্বন্ধে আমরা প্রাণের কথা একবার বলিতে পারি। বর্ত্তমান সময়ে যে তীব্র দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহাতে কে বলিতে পারে, আপনাদিগকে আর কিছু বলিবার স্বাধীনতা আমার থাকিবে কি না? কে বলিতে পারে, আগামী বৎসরের কর্ম্মে আপনাদের নেত্রী-রূপে কাজ করিবার স্বাধীনতা আমার থাকিবে কি না! আমার কাজ যদি ব্যাহত না হয়, তাহা হইলে আমি আগামী বৎসরের জন্য আপনাদের সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা আমাকে আপনাদের সভানেত্রীর পদে বরণ করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন, যতদিন আপনাদের শ্রদ্ধার অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন না হই ততদিন আমার সহকারী হউন। আপনারা যে সকল সময়েই আমার সহিত একমত হইবেন, তাহা হইতে পারে না; আপনাদের সমালোচনায় আমি সঙ্কুচিত হইব না। আমি কেবল এইটুকু প্রার্থনা করি যে, আমার শত্রুগণ যাহা কিছু বলিবে, আপনারা তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া

লইবেন না—শক্রগণ যাহা বলিবে তাহার সকল কথার উত্তর দিবার আমার সময় নাই। আমি অঙ্গীকার করিতে পারি না যে, সকল সময়েই আপনাদের তুষ্টিবিধান করিতে পারিব। আমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিতে পারি যে, সেবা সম্বন্ধে আমার যাহা আদর্শ, সেই আদর্শের অনুসারে আমি প্রাণ-পণে জাতির সেবা করিব। সকল সময়েই যে আপনাদের কথা আমি স্বীকার করিব, এবং আপনাদের অনুবর্ত্তন করিব, এমন অঙ্গীকারও আমি করিতে পারি না। নেতার কর্ত্তব্য পরিচালন করা। নেতা তাঁহার সহযোগিগণের সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিবেন, তাঁহাদের উপদেশ সকল সময়ে শুনিবেন; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের নিকট শেষ দায়িত্ব যখন তাঁহার, তখন শেষ মীমাংসার অধিকারও তাঁহার। সেনাপতির তাঁহার সহকারী ও সৈন্যগণ অপেক্ষা অধিক দূরদর্শী না হইলে চলে না। কিন্তু যুদ্ধ যখন চলিতেছে, সে সময় প্রত্যেক গতির হেতু তিনি ব্যাখ্যা করিতে পারেন না; ফলের দ্বারা তিনি নিন্দিত বা প্রশংসিত হইবেন। আমি জানি যে, প্রেম ও সেবার দ্বারা আমি ভারতসন্তান, কিন্তু জন্মের দ্বারা নহি। এই কারণে আমি নেতৃত্বের অধিকার কখন দাবী করি নাই, যুদ্ধের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াছি মাত্র। এখন আপনাদের কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া আপনারা যে স্থান দিয়াছেন, সেই স্থান গ্রহণ করিলাম, এবং যোগ্যভাবে এই স্থান পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব। নিজের কথা যথেষ্ট বলিলাম, এইবার মায়ের কথা বলি।

ভারতমাতা স্বাধীন হইয়াছেন, জগতের জাতি-সমূহের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সর্ব্বত্র সম্মানিত, তাঁহার অতীত যেমন মহান্, বর্ত্তমানও ঠিক তেমনই হইয়াছে, আরও অধিকতর গৌরবময় ভবিষ্যৎ-নির্ম্মাণের জন্য সাধনা চলিতেছে এই মহা দৃশ্য দর্শনের আকাঙ্ক্ষা কি এমন উৎসাহকর নহে, যাহার জন্য পরিশ্রম করা যায়, ক্লেশ ভোগ করা যায়;

সমগ্র জীবন উৎসর্গ করা যায়, এবং মরিতে পারা যায় ? আধ্যাত্মিকতার জন্য এত অধিক অনুরাগ উদ্দীপিত করিতে পারে, এমন দেশ কি আর আছে ? সাহিত্যের জন্য এত প্রশংসা উদ্দীপিত করিতে পারে, সৎসাহসের জন্য এত ভক্তি উদ্দীপিত করিতে পারে, এমন দেশ কি আর আছে ? জাতি-সমূহের চির-গৌরবময়ী জননী, আজ ইউরোপের ও আমেরিকার যে সমুদয় জাতি পৃথিবীর নেতৃত্ব করিতেছে, এই মাতার গর্ভে জন্মিয়াইতো তাহারা প্রবাসে যাত্রা করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জননীর খড়্গ ভাঙ্গিয়া যাইবার পর আমাদের এই ভারতমাতা যত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, এত ক্লেশ কি আর কাহাকেও ভোগ করিতে হইয়াছে ? তদবধি এসিয়া ও ইউ-রোপের জাতি-সমূহ তাঁহার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্রবাহের মত বহিয়া গিয়াছে, তাঁহার নগরী-সমূহ শ্মশান করিয়াছে, তাঁহার রাজন্যবর্গের মুকুট কাড়িয়া লইয়াছে। তাহারা জয় করিবার জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ এই দেশে থাকিতে গিয়া, এই দেশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। অবশেষে অপূর্ব্ব শিল্পী বিধাতা এই সমুদয় সংমিশ্রিত জাতিসমূহের মধ্য হইতে এক জাতি গড়িয়া তুলিয়াছেন—এই জাতি যে কেবলমাত্র ভারতের সদ্‌গুণ-সমূহে সমলঙ্কৃত, তাহা নহে,; তাহার আততায়িগণ যে সকল সদ্‌গুণ-সম্ভার সঙ্গে আনিয়াছিলেন, আজ সেই সদ্‌গুণাবলিই রহিয়াছে, দোষগুলি অপসৃত হইয়াছে, এবং সে সমুদয় সদ্‌গুণ আজ ভূষণস্বরূপ হইয়াছে।

কল্পকল্পান্তরের ইতিহাস মর্ত্ত্যমানবের দৃষ্টিশক্তি অতিক্রম করিয়া ভারত-বর্ষ ও ভারতবাসীর সহিত জড়িত রহিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ অতীতের কত বড় বড় সভ্যজাতির সহচর-রূপে একত্র জীবন ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু মরিতে জানেন না, মরেন নাই; তাহাদের উদ্ভব, উন্নতি ও বিনাশ দেখিয়াছেন! সে সকল মহাজাতি আজ আর নাই; পৃথিবীর গভীর বক্ষে

তাহারা সমাহিত হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাদের স্মৃতিফলক উপরে পড়িয়া আছে! সেই সনাতন ভারতবর্ষ কত কাজ করিয়াছেন, কত বিজয়লাভ করিয়াছেন, কত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন! এখন আবার সমুদয় পরিবর্ত্তনের পরেও অব্যাহত অক্ষুণ্ণ অবস্থায় এই ভারতবর্ষই জগতের জাতিসমূহের মধ্যে যেন ক্রুশবিদ্ধ!—এখন আবার 'পুনরুত্থানে'র নব জাগরণের প্রভাতে আসিয়া সেই ভারতবর্ষ দাঁড়াইয়াছেন—ইনি অমর, অসীম গৌরবময়, চির-নবীন!—অচিরে দেখিতে পাইব এই ভারতবর্ষ আবার উন্নতশির, স্বাবলম্ব, সবল, স্বাধীন হইয়া এসিয়ার উজ্জ্বল গৌরব, পৃথিবীর আলোক ও আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ হইয়া সভ্য জগতের মধ্যে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন!